
কিশোর গ্রন্থাবলী
সুমথনাথ ঘোষ

স্মন্মথনাথ ঘোষ

কিশোর-গ্রন্থাবলী

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৭৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩
—দশ টাকা—

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—অজিত গুপ্ত
মুদ্রণ—কুইক প্রিন্টিং সার্ভিস

মিত্র ও ঘোষ, পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীবিভাসকুমার গুহঠাকুরতা কর্তৃক ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

বাংলার
টার্জন

যখনকার কথা বলছি তখন আমাদের দেশে রেলগাড়ী বা মোটরগাড়ী আসে নি এমন কি অনেক জায়গায় ঘোড়ারগাড়ীর পর্য্যন্ত প্রচলন ছিল না। কাছাকাছি কোথাও যেতে হ'লে পালকি এবং দূর বিদেশে যাবার জন্য নৌকোই ছিল একমাত্র বাহন।

নদী তখন ভরা থাকতো কূলে কূলে, তাতে নিয়মিত জোয়ার ভাঁটা খেলতো। এখনকার মত কেউ পায়ে হেঁটে নদী পার হ'তে পারতো না বা কচুরি-পানা ও শর-কলমীর দামে বোঝাই খানিকটা জায়গা দেখিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতো না, এই ভৈরব—এই ইছামতী।

তখনকার নদীর রূপ ছিল, ছিল যৌবন। তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছিল বলিষ্ঠের তেজোদ্দীপ্ত নির্ভীকতা, কুলু-কুলু ধ্বনিতে বজ্র-কঠোর নিনাদ। এখনকার বাঙ্গালীকে দেখলে যেমন বোঝা যায় না যে একদিন এই লোকেরাই বাঘের সঙ্গে লড়াই করতো, এই লোকেরাই মগ ও মোঘলদের বিরুদ্ধে লাঠি ধরে রক্ষা করেছিল নিজের দেশকে ; তেমনি এখনকার নদী দেখে তখনকার নদীর সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করা যায় না। মোট কথা জলপথেই তখন সকলে যাতায়াত করতো এবং নৌকোই ছিল তাদের একমাত্র ভরসা।

একটু অবস্থাপন্ন লোক যাঁরা, তাঁদেরই নিজস্ব নৌকো, বজরা, পান্‌সি প্রভৃতি থাকতো। এবং মাঝি-মাল্লাদের তাঁরা নিজেদের বাড়ীতে বারো মাস পুষতেন।

ঘোষালদের তখন নামডাক খুব। এত বড় জমিদারী এবং এত বিষয়-সম্পত্তি অর্থ ও যশ ছিল যে সরকার থেকে তাঁদের খেতাব দেন রাজা। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ হ'লেন এই বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

তাঁর পিতা বিষ্ণুনারায়ণের অবশ্য বিষয়-সম্পত্তি, যশ, অর্থ যে একেবারে কিছুই ছিল না তা নয়, তবে যে সৌভাগ্যের শিখরে আরোহণ করলে সরকারের উচ্চতম কর্ম্মচারীদের কাঁধে হাত দিয়ে চলা যায় সে স্থান পর্য্যন্ত তিনি যেতে পারেন নি। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ এমন সুকৌশলে বিষয়-সম্পত্তি বাড়াতে লাগলেন যে তাঁর যা ছিল দেখতে দেখতে তার চতুর্গুণ হয়ে উঠলো। মা-লক্ষ্মী যে কোথা দিয়ে এসে তাঁর বাক্সে প্রবেশ করলেন, তা কেউই ভেবে পেলে না।

এখন যে জায়গাটাকে কালীঘাট বলে সেইখানে ছিল তাঁর প্রকাণ্ড চারমহলা বাড়া। কত দাস-দাসা লোক-লস্কর, কত সিপাই-বরকন্দাজ, কত দাঁড়ি-মাঝি যে সেখানে থাকত তা গুনে স্থির করা যায় না। দিনরাত তাদের ভিড় লেগে থাকে বাড়ীতে, তাদের কোলাহলে বাহিরমহল সর্ব্বদা মুখরিত।

একদিকে তিনি যেমন গুণীর আদর করতেন, বহু অনাথ ও দরিদ্র লোককে আশ্রয় দিতেন এবং বহু অর্থব্যয়ে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতেন, অন্যদিকে আবার তিনি ছিলেন তেমনি হিসেবী, তেমনি ন্যায়পরায়ণ! এতটুকু অন্যায় এতটুকু অবিচার তিনি সহ্য করতে পারতেন না। লাঠির সাহায্যে কিংবা ঘরে আগুন লাগিয়ে কিংবা লুঠতরাজ ক'রে—যেমন ক'রে হোক তিনি শাস্তি দিতেন সেই সব লোকেদের, যারা অবাধ্য হ'তো তাঁর। প্রজারা তাঁকে ভয় করতো যমের মত, আবার ভক্তি করতো এবং ভালবাসতো পিতার মত। তাই তাঁর রাজ্যে ছিল যেমন শান্তি, তেমনি শৃঙ্খলা।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণের বয়স বেশী নয়, মোটে বত্রিশ। কিন্তু এই অল্প বয়সে এতখানি কর্ম্মকুশলতা দেখে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে যেতো। এক মুহূর্ত্ত তিনি চুপ ক'রে বসে থাকতেন না; আলস্যে বা খোশগল্পে গা ঢেলে দিয়ে বৃথা কালাতিপাত করতেন না—সাধারণ ধনী লোকদের মত। তিনি দিনরাত ডুবে থাকতেন কর্ম্মের স্রোতে। জমিদারির প্রতিটি কাজ, প্রতিটি খুঁটিনাটির হিসেব নিজে রাখতেন এবং নিজে তদ্বির করতেন। তিনি কর্ম্মচারীদের ভালবাসতেন এবং তাদের ওপর তাঁর বিশ্বাসও ছিল খুব; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজে সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাদের কাজে অনুপ্রাণিত করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে এই সৌহার্দ্দ্য বা প্রীতি না থাকলে কখনো তাদের কাছ থেকে পুরো কাজ পাওয়া যায় না; তাই নিজেই সব কাজ দেখাশোনা করতেন।

যৌবনের তাজা রক্ত তাঁর শিরায়-উপশিরায় চঞ্চল ও উৎক্ষিপ্ত—প্রাণশক্তির এত প্রাচুর্য্য সাধারণতঃ ধনীর মধ্যে দেখা যায় না। বলিষ্ঠ, নির্ভীক, পেশীবহুল দেহ, মুখে সর্ব্বদা হাসি লেগে আছে। কন্দর্পের মত চেহারা—যেন ভগবান তাঁর রূপের ভাণ্ডার উজাড় ক'রে দিয়েছেন এই লোকটার শরীরে।

বন্দুক ছুঁড়তে, লাঠি খেলতে, অসি চালনা করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। যখন কোন কাজ না থাকতো তিনি পালোয়ানদের সঙ্গে লাঠি ও অসি খেলা করতেন। কখনো বা একখানা নৌকো নিয়ে গঙ্গায় পাড়ি দিতেন; কখনো বা মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাল-বৈশাখীর ঝড় মাথায় ক'রে ছুটে যেতেন বাত্যা-বিক্ষুব্ধ ভয়-ভীষণ গঙ্গার মধ্যে। কতবার তার পাল ছিঁড়ে গেছে, হাল ভেঙে গেছে, তুফানের মধ্যে পড়ে নৌকো উল্টে গেছে, গঙ্গার জলে হাবুডুবু খেয়ে জীবন বিপন্ন হয়েছে—মাঝি-মাল্লারা তাদের প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে তাঁকে রক্ষা করেছে, কিন্তু তবুও তিনি ভয় পেয়ে তা থেকে নিশ্চেষ্ট হন নি। বার বার ছুটে গিয়েছেন সেই কাজে এবং বার বার তাঁর জীবন রক্ষা করার জন্য প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিয়েছেন মাঝিদের। মনে তাঁর অদম্য সাহস, দেহে সিংহবিক্রম। মৃত্যুকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাই বার বার তার সঙ্গে খেলা করতে ভালবাসেন।

শিকারে তাঁর আনন্দ। শিকার করতে গিয়ে কতবার তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে; কতবার তিনি বাঘের মুখে পড়েছেন; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর হাত কাঁপে নি, মন দুর্ব্বল হয় নি। অমিতবিক্রম ও দুর্জ্জয় সাহসে তাঁর বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠেছে। দৃঢ় হস্তে বন্দুক তুলে ধ'রে তিনি বার বার গুলি ছুঁড়েছেন। অজেয়, নরখাদক বাঘের রক্তাক্ত দেহের ওপর ব'সে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন—আসুরিক তৃপ্তিতে সারা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

বিপদের সম্মুখীন হ'লে যেন তাঁর চেহারা বদলে যায়, তাঁকে আর চেনা যায় না রাজা ইন্দ্রনারায়ণ ব'লে। হাজার হাজার যুগের শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতা মনুষ্যত্ব এক নিমেষে ছিঁড়ে, টুটেফুটে কোথায় মিলিয়ে যায়। তার বক্ষের মাঝে রক্ত তাণ্ডব নৃত্য ক'রে ওঠে। অন্তরে তিনি অনুভব করেন মানবের আদিম ক্ষুধা—রক্তের ক্ষুধা, মাংসের ক্ষুধা, সংগ্রামের ক্ষুধা।

মনে হয়, এখনো ত তাঁর শিরায়-উপশিরায় সেই সব আদিম মানবের রক্ত প্রবাহিত হ'চ্ছে। তিনি ত তাদেরি বংশধর। যারা একদিন কাঁচা মাংস খেয়ে পর্ব্বতগুহায় বাস করতো; বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো—তিনি ত তাদের বংশধর। তবে কেন তিনি চুপ ক'রে বসে থেকে আলস্যে দিন কাটাবেন কাপুরুষের মত?

বাঙ্গালী জাত ভীরু, দুর্ব্বল জাতে পরিণত হয়েছে। শৃগাল দেখলে তারা ভয় পায়, লাঠি দেখলে তাদের বুক কাঁপে। অন্যের হাতে নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তুলে দিয়ে তারা এখন পরম নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করে।

কিন্তু সে সময় লোকেরা এভাবে বাস করতে পারতো না। নিজেরা নিজেদের রক্ষা করতো। নিজেদের বাহুবলের প্রতি ছিল তাদের অগাধ বিশ্বাস, অগাধ শ্রদ্ধা। চোর-ডাকাত, বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য তাদের সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকতে হ'তো। তাই আজও বাংলার লাঠিয়ালদের কথা শুনলে সবার মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ এই সব লাঠিয়ালদের মধ্যে থেকে বাছাই করা লোক এনে নিজের বাড়ীতে রেখেছিলেন। টাকাকড়ি নিয়ে দেশ-বিদেশ যাবার সময় তারা থাকতো সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে। দুষ্ট প্রজাদের শাসন করবার সময়ও তিনি পাঠিয়ে দিতেন তাদের। তাদের সাহস ও তাদের লাঠি চালনার কৌশলের কথা এখনো অনেক বৃদ্ধদের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। বন্দুকের গুলি ও তীক্ষ্ণধার অসি ব্যর্থ হ'তো তাদের এই লাঠির কাছে।

যেমন মনিব তেমনি তাঁর উপযুক্ত ভৃত্য, লোক-লস্কর, কর্ম্মচারী। সবাই জোয়ান, সবাই দুর্দ্দান্ত—কেউ কমতি যায় না ক্ষমতায়। কিন্তু হায়! এত লোকবল, এত অর্থবল থাকা সত্ত্বেও একদিন এমন একটা অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যার জন্য রাজা ইন্দ্রনারায়ণ নিজের ভাগ্যকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষ দিতে পারলেন না। এই প্রথম তাঁর পরাজয়—এই প্রথম তাঁর বীর্য্য, তাঁর দম্ভ, পদদলিত হ'লো। তিনি কখনো কারো কাছে মাথা নত করেন নি। যত বড় বিপদ আসুক না কেন, হাসিমুখে তাকে বরণ করেছেন; কিছুমাত্র বিচলিত হন নি। খরস্রোতা নদী যেমন চলতে চলতে সামনে বাধা

পেলে আরো প্রবল ভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি ছিল রাজা ইন্দ্রনারায়ণের স্বভাব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হ'লো না। তিনি মনে বড় ব্যথা পেলেন, শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। তাঁর সেই কঠিন অন্তরের মধ্যে যে স্থানটুকু ছিল সকলের চেয়ে মধুর, সকলের চেয়ে কোমল, কে যেন তার মর্ম্মে শেলাঘাত করলে। বিরাট পাহাড়ের বুকে যে ক্ষীণ স্রোতস্বিনীটুকু ছিল নিমেষে তা কোথায় মিলিয়ে গেল।

ব্যাপ্যারটা হ'চ্ছে এই। রাজা ইন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী বিভাবতী দেবী বারো বছর পরে বাপের বাড়ী যাবেন। জমিদারের বৌ, রাণীমা যাবেন পিতৃগৃহে; কাজেই আয়োজনটা সেইভাবেই হ'তে লাগল। তার ওপর দীর্ঘ বারো বৎসর পরে তিনি যাচ্ছেন প্রথম সেখানে। আট বছরের বালিকা বধূরূপে ঢুকেছিলেন সেই বাড়ীতে, আর কুড়ি বছর বয়সে সর্ব্বময় কর্ত্রী, রাণীমা হয়ে বাপমায়ের কাছে যাচ্ছেন এই প্রথম। কাজেই জমিদারবাড়ীতে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল।

সে-সময় ঘোষালবাড়ীর এই নিয়ম ছিল যে যতদিন না নববধূর কোন শিশুসন্তান জন্মায় ততদিন পর্য্যন্ত তিনি শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী যেতে পাবেন না। তাই দীর্ঘদিন পরেও যখন রাণী বিভাবতীর কোন শিশুসন্তান জন্মাল না, তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাজা ইন্দ্রনারায়ণের মনেও বিশেষ সুখ-শান্তি ছিল না এই অপুত্রক অবস্থার জন্য এবং মাঝে মাঝে তিনিও অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়তেন। রাজার এই মানসিক অবস্থা লক্ষ্য ক'রে রাণী গোপনে কান্নাকাটি করতেন এব অনেক দেবতার দোরে মাথা খুঁড়তেন।

শেষে এক সন্ন্যাসীর প্রদত্ত মাহুলী ধারণ ক'রে রাণীমার একটি পুত্রসন্তান জন্মাল। রাজার মুখে হাসি ফুটলো, রাণীর অন্তরে পুলকের বন্যা ছুটলো—আনন্দ, উৎসব, দান, ধ্যান, কাঙ্গালী-ভোজন, ব্রাহ্মণ-ভোজন সাত দিন ধ'রে ক্রমাগতই সমানে চলতে লাগল জমিদারবাড়ীতে। এতদিন সবার অন্তরে অলক্ষ্যে যেন একটা বিষাদের মেঘ জমে ছিল, আজ তা কোথায় মিলিয়ে গেল। সন্ন্যাসী ঠাকুর একটি বড় তামার মাহুলী দিয়ে বলেছিলেন, মা-কালীর নাম লিখে নবজাত শিশুর দক্ষিণ হস্তে বেঁধে দিলে কোনদিন কেউ তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না—সহস্র বিপদের মাঝেও সে নিরাপদে থাকবে। তাই রাণীমা সেই মাহুলী অতি সাবধানে অথচ দৃঢ়ভাবে শিশুর হাতে বেঁধে দিলেন এবং তাতে জাতকের নাম ধাম বিবরণ লিখে রেখে মনে মনে বললেন, ছেলেকে মা-কালীর শ্রীচরণেই অর্পণ করলুম, মা তোমার সন্তানকে তুমি রক্ষা ক'রো।

তারপর তিন-চার মাস কেটে গেল। আনন্দ, উৎসব, পূজা, মানত সব শেষ হ'লো। তখন শুরু হ'লো রাণীর বাপের বাড়ী যাবার পালা—বিরাট উদ্যোগ, বিপুল আয়োজন, চারিদিকে সাজ সাজ রব। পাইক সাজলো, বরকন্দাজ সাজলো, মাঝি-মাল্লারা সাজলো—রঙীন কাপড়, রঙীন জামা, রঙীন চাদরের মেলা বসে গেল। ঘাটে কত নৌকো, কত বজরা, কত পান্‌সি। সান্ত্রী পাহারা লাঠিয়াল চললো সামনে পিছনে। ভারে ভারে মিষ্টান্ন, নতুন খাটবিছানা, নতুন বাসনকোসন এলো—নানা দ্রব্যসম্ভারে নৌকো বোঝাই হতে লাগল।

মাঝখানে এক বিরাট ময়ূরপঙ্খী, পঞ্চাশজন দাঁড়ি-মাঝি নিয়ে ঝলমল করতে লাগল। কত বিচিত্র রং, কত অপূর্ব্ব কারুকার্য্যের সমাবেশ তাতে।

ভিতরে মখমলের বিছানায় মখমলের তাকিয়া, বালিশ; মাথার ওপরে রেশমের চন্দ্রাতপ, তার সূক্ষ্ম জরির ঝালর মৃদু হাওয়ায় ঝিক্‌মিক্ করছে, জানলায় নেটের পর্দ্দা সুশোভিত।

মূল্যবান পরিচ্ছদ ও হীরা-মুক্তার গহনায় সুসজ্জিত হয়ে শিশুপুত্রকে বুকের মধ্যে নিয়ে রাণীমা এসে ঢুকলেন ময়ূরপঙ্খীর মধ্যে। শঙ্খধ্বনি হ'লো, একে একে নৌকো ছেড়ে দিল।

সারি দিয়ে চলেছে কুড়িখান নৌকো।

মেঘহীন নির্ম্মল আকাশ থেকে কাঁচা রোদ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। গঙ্গা কূলে কূলে ভরা। ঢেউগুলো ছলছল কলকল ক'রে নৌকোর গায়ে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। দু'পাশে ঘনশ্যাম শোভা। মাঝে মাঝে কতকগুলি কুঁড়েঘর, ছোট্ট গ্রাম, অল্প লোকজন; কোথাও কোথাও বা ঘন নিবিড় বন, একেবারে জলের ওপর ঝুলে পড়েছে, কোথাও বাঁশ কাঠ দিয়ে ঘেরা ঘাটে মেয়েরা স্নান করছে, কেউ বা মাটির কলসী ক'রে জল নিয়ে যাচ্ছে; দু'একটা নৌকো হয়ত বাঁধা কোথাও কোন গাছের নীচে। জানালার পর্দ্দা ফাঁক ক'রে তাই দেখতে দেখতে রাণীমা চলেছেন।

মাঝিরা পাল তুলে দিয়ে হাল ধ'রে বসে রইল। নৌকোগুলো ঢেউ কেটে কেটে ছুটে চলতে লাগল সবেগে। লাল, নীল, সবুজ—তাদের কত রং, কত শোভা। হাওয়ায় পালগুলো ফুলে ফুলে উঠছে—মনে হয় যেন এক ঝাঁক পাখী উড়ে যাচ্ছে আকাশ দিয়ে।

আবার কোথাও কোন সলজ্জ পল্লীবধূ ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক ক'রে এই দৃশ্য দেখছে; কোথাও বা দু'টি একটি শিশু উলঙ্গ হয়ে বিস্ময়ে সেই দিকে তাকিয়ে আছে।

ক্রমশঃ বেলা বাড়তে লাগল—সূর্য্য ধীরে ধীরে মাথার ওপর উঠলো। নির্জ্জন ঘাট; পল্লীর পথে লোকজন দেখা যায় না। স্তব্ধ প্রকৃতি; দূরে ঢেউগুলি দর্পণে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় চোখে এসে লাগছে। মাথার ওপরে বহুদূরে কোথাও দু'একটি চিল উড়ছে; সেইখান থেকে ভেসে আসছে তাদের অতি মৃদু, অস্পষ্ট সঙ্গীত। নদী এঁকে-বেঁকে চলেছে গ্রামের মধ্যে দিয়ে, ক্ষেতের কিনারা দিয়ে, গৃহস্থের বাড়ীর আনাচ-কানাচ দিয়ে।

ফাল্গুন মাস শেষ হয় হয়। শীত কেটে গেছে, কিন্তু শীতের আমেজ তখনো একটু-একটু রয়েছে। সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে পড়লো। আবার পল্লীর পথে, ঘাটে, মাঠে লোকজন চলাচল শুরু হ'লো। হাওয়ার জোর একেবারে কমে গেল। মাঝিরা পাল নামিয়ে দিয়ে দাঁড় টানতে লাগল।

দিনের চিতা জ্বলে জ্বলে নিভে গেল পশ্চিম আকাশে। তার শেষ আভাটুকু ভাল ক'রে মিলতে না মিলতে এলো অন্ধকার গাছপালা ঝাপসা ক'রে, প্রকৃতির মুখে কালো যবনিকা টেনে। একটি দু'টি করে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলে উঠলো কালো আকাশের গায়ে; তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ এক কোণে উঁকি মারতে লাগল। আবার মাঝিরা পাল তুলে দিলে, আবার হাওয়ার জোরে

নৌকো চলতে লাগল আপনি। নৌকোয় নৌকোয় আলো জ্বলে উঠলো। অন্ধকার রাত্রে মনে হয় যেন কতকগুলো আলো ভেসে ভেসে চলেছে। রাণীমার ভারী ভাল লাগল এ দৃশ্য। তিনি জানলার পর্দ্দা একেবারে খুলে দিলেন এবং শুয়ে শুয়ে অবাক হয়ে এই সব দেখতে লাগলেন।

অকস্মাৎ দূর থেকে একজন মাঝি গান ধরলো ভাটিয়ালি সুরে; আরো দু'একজন অন্য নৌকো থেকে তারি সুরে গলা মিলালো; অন্যান্য মাঝিরা নিস্তব্ধ হয়ে সেই গান শুনতে লাগল। তাদের সেই অশিক্ষিত কণ্ঠের গ্রাম্য সুর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল—আকাশের তারায়, নদীর জলে, অরণ্যের কালো বুকে।

রাত গভীর হ'লো। রাণীমা জানলার পর্দ্দা টেনে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

কত বড় নদী, কত ছোট নদী, কত শাখানদীর মধ্যে দিয়ে নৌকোগুলি চলতে লাগল এঁকে-বেঁকে।

বাখরগঞ্জ জেলার এক গ্রামে রাণীমার বাপের বাড়ী; সেইখানে যাবার মত সংক্ষিপ্ত পথ, তাই দিয়ে মাঝিরা এগুতে লাগল।

মাঝিদের বিরাম নেই—নৌকো সারারাত ধরে চ'লেছে। ছপাৎ ছপাৎ দাঁড়ের শব্দ, মাঝে মাঝে হালের আওয়াজ ক্যাঁচ-ক্যাঁচ—রাত্রির সেই নীরবতা ভঙ্গ ক'রে, একটানা একঘেয়ে চলছে ত চলছে। একজন খানিকটা ঘুমোয়, আর একজন খানিকটা জাগে; এই ভাবে জোয়ার ভাঁটায় নৌকো বাইতে বাইতে রাত কেটে গেল।

ভোর হ'লো। আবার দিনের আলোয় প্রকৃতি জেগে উঠলো। মাঠ, ঘাট, নদী, অরণ্য হয়ে উঠলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর। সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেলও প্রায় যায়-যায় হয়েছে, এমন সময় দূর আকাশের ঈশান কোণে একখণ্ড কালো মেঘ দেখা দিল। মাঝিরা সকলকে সাবধান ক'রে দিলে। যে যার হালদাঁড় দৃঢ় ক'রে ধরলে।

সমস্ত প্রকৃতি থমথম করছে। একটু পরেই হাওয়ার বেগ বেড়ে উঠল এবং দেখতে দেখতে তা প্রবল ঝড়ে পরিণত হ'লো। আকাশখানা ভরে গেল কালো মেঘে। পালগুলো নামাতে নামাতে ঝড় তাকে ওলট্-পালট্ ক'রে দিয়ে গেল। নৌকো এক-একটা এক-একদিকে ছিট্‌কে পড়লো। নদীর মূর্ত্তিও সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল। কে যেন কালি ঢেলে দিলে তার মুখে। গম্ভীর হুঙ্কারে সে গর্জ্জে উঠলো। কালো ঢেউগুলো উন্মাদের মত অট্টহাস্য করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়লো নৌকোগুলোর ওপর—টলমল করতে লাগলো নৌকোগুলো। সামাল সামাল ক'রে মাঝিরা চীৎকার ক'রে উঠলো। রাণীমা ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল ঝরঝর ক'রে। কিন্তু হায়, প্রকৃতির এই দুরন্তপনার কাছে মানুষ আর কতটুকু—কত ক্ষীণ তার কণ্ঠস্বর! কে কাকে রক্ষা তখন করে? কে কার কণ্ঠস্বর শোনে? নৌকো তখন মাতালের মত টলমল করছে, মাঝিরা হাল ধরতে পারছে না, দাঁড় ধরতে পারছে না; তাদের মাথা ঘুরছে—কোন্ দিকে যাবে, কোন্ পথ ধরবে? এলোমেলো ঝড়ে কে কোথায় চলে গেল তা কে জানে!

ঝম্‌ঝম্ ক'রে বৃষ্টি নামল। রাণীমা বাইরের দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠলেন। এ কোথায় তিনি এলেন? জলে স্থলে সমস্ত একাকার হয়ে গেছে। কোন দিকে দেখা যায় না এতটুকু ডাঙ্গা। জল, শুধু জল, অনন্ত অপার—আকাশের সঙ্গে জলের মহামিলন। আতঙ্কে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলেন অপর নৌকাগুলোর কোন চিহ্ন নেই। তিনি চিৎকার ক'রে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কোথায় গেল, কোন্ পথে?

মাঝিরা বললে, কেমন ক'রে জানবো মা? এই দুর্য্যোগে কি পথ ঠিক করা যায়! তবে কোন মতে এই বজরাটি রক্ষা করেছি। এখন যে কোন্ দরিয়ার মাঝে এসে পড়েছি তাও জানি না। তবে আর ভয়ের কারণ নেই, ভগবান্ মুখ তুলে চেয়েছেন; বৃষ্টি নেমেছে, নদী এখনি শান্ত হয়ে যাবে।

তাদের কথা শুনে রাণীমা মোটেই স্থির হ'তে পারলেন না। তাঁর বুক দুর্ দুর্ ক'রে কাঁপতে লাগল, জিভ শুকিয়ে এলো। প্রাণপণে ছেলেটিকে বুকে চেপে ধ'রে তিনি ভগবানকে ডাকতে লাগলেন।

এর উপর আবার এলো সন্ধ্যা। অন্ধকারে সমস্ত অদৃশ্য হয়ে গেল। কোন্ দিকে এখন যাবে তারা? ভয়ে মাঝিদের মুখ শুকিয়ে গেল। ডাইনে, বামে, সামনে, পিছনে শুধু রাশি রাশি অন্ধকার, আর কালো জলের উন্মত্ত কলকল ছলছল শব্দ; আকাশ ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন। বৃষ্টি তখনো টিপ্ টিপ্ ক'রে পড়ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের অস্পষ্ট আলোকে প্রকৃতির ভয়াল মূর্ত্তি তাদের চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

তবু তারা ক্ষান্ত হ'লো না। মনে মনে একটা দিক স্থির ক'রে সেইদিকে চলতে লাগল।

কিন্তু হায়! অনেক দূর যাবার পর তাদের হুঁশ হ'লো যে, তারা ভুল পথে চলে এসেছে। এ যে তারা সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়েছে—বড় বড় ঢেউ, নোনা জলের গন্ধে তারা সচকিত হয়ে উঠলো।

রাত্রি তখন অনেক হয়েছে। বৃষ্টি থেমে গেছে বটে কিন্তু সমস্ত প্রকৃতি যেন থম্ থম্ করছে; কি করবে? কোন্ পথে যাবে? মাঝিরা তাই ভাবছে—এমন সময় দ্যুম দ্যুম ক'রে দু'টো বন্দুকের আওয়াজ হ'লো।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্ত্তনাদ ক'রে দু'জন মাঝি জলের মধ্যে পড়ে গেল। আবার গুলির আওয়াজ হ'লো। আবার কয়েকজন যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠলো। তখন তারা বুঝতে পারলে যে, তারা ডাকাতের হাতে পড়েছে। রাণীমা তখন চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগলেন।

মগ ডাকাত, মগ ডাকাত, ক'রে মাঝিরা চীৎকার ক'রে উঠলো এবং লাঠি, সড়কি, বন্দুক নিয়ে তারাও যুদ্ধ করতে শুরু করলে। তারাও বন্দুক ছোঁড়ে, এরাও বন্দুক ছোঁড়ে। তাদের লোক মরে, এদেরও লোক মরে। কিন্তু ডাকাতরা যখন চারিদিক থেকে একেবারে ঘিরে ফেললে, তখন এদের আর কোন উপায় রইল না, তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'লো। ঝপ্ ঝপ্ ক'রে তারা প্রায় জন পঞ্চাশ লোক বন্দুক হাতে লাফিয়ে পড়লো ময়ূরপঙ্খীর ওপর এবং কুড়ুল মেরে ভেঙ্গে ফেললে ঘরের দোর।

২

রাণীমা তখন ছেলেটিকে প্রাণপণে বুকে চেপে ধ'রে অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন। ডাকাতরা ঘরে ঢুকে যেখানে যা কিছু মূল্যবান জিনিস ছিল সব লুটপাট ক'রে নিলে এবং তাঁকে ধরাধরি ক'রে তুলে নিয়ে গেল তাদের নৌকার মধ্যে। তারপর চারিদিক থেকে গুলিমেরে ফুটো ক'রে দিলে ময়ূরপঙ্খীটা—নিমেষে তা অতল সাগরগর্ভে বিলীন হয়ে গেল। যে ক'জন মাঝি তখনো জীবিত ছিল তারাও সেই সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলে।

মগ ডাকাতদের প্রাণে দয়া নেই, মায়া নেই। তারা বজ্রের মত কঠিন, তারা উল্কার মত ভয়ঙ্কর। মানুষের জীবন নিয়ে তারা ছেলেখেলা করে। অর্থপিশাচ তারা; টাকাকড়ি ধনরত্নের মূল্য তাদের কাছে সকলের চেয়ে বড়, সকলের চেয়ে দামী। একটা পয়সার জন্যে তারা একটা মানুষকে খুন করতে পারে—রক্ত নিয়ে তারা হোলী খেলে।

রাণীমা তখনো অচৈতন্য হয়ে আছেন। ডাকাতেরা যে তাঁকে তাদের নৌকার মধ্যে নিয়ে গেছে তা তিনি জানতেও পারেননি। তারা তখন একে একে তাঁর দেহ থেকে হীরা-মুক্তার অলঙ্কার সব খুলে নিতে লাগলো। কানে তাঁর মূল্যবান হীরার দুল ছিল। একটা তারা অনেকক্ষণ ধ'রে চেষ্টা ক'রেও খুলতে পারলে না—টানাটানি করতে লাগল। শেষে সর্দ্দার এসে একখানা ছুরি বার ক'রে কচ্ ক'রে সেই কানটা কেটে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে রাণীমার চমক ভাঙ্গলো। তিনি একটি তীব্র আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন এবং চোখ মেলতেই দেখলেন ষণ্ডা ষণ্ডা কতকগুলো লোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কালো যমদূতের মত তাদের চেহারা। কারো হাতে বন্দুক, কারো হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার, ছোরা,—ঝলমল করছে সেই অস্পষ্ট আলোতে।

আরো জোরে শিশুপুত্রটিকে তিনি বুকে চেপে ধরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।

ডাকাতেরা একে একে মাতা ও পুত্রের দেহ থেকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে নিলে এবং একটা ছোট্ট পানসিতে তাদের চাপিয়ে তীর বেগে ছুটতে লাগলো অকূল সমুদ্রের মধ্যে।

অন্ধকার রাত। তখনো মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নৌকোটা ছুটতে ছুটতে শেষে একটা দ্বীপের কাছে গিয়ে হাজির হ'লো এবং ক্রমশঃ তার গতিটা কমে আসতে লাগল। একেবারে ডাঙ্গার কাছাকাছি এসে নৌকোটা লাগতেই দু'জন ডাকাত রাণীমার দেহটাকে ধরাধরি ক'রে সেইখান থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে দ্বীপের ওপর। তখনো তাঁর বুকের মধ্যে ছেলেটি দৃঢ়ভাবে ধরা ছিল।

মাথায় দারুণ আঘাত পেয়ে তাঁর চৈতন্য আবার ফিরে এলো। তাঁর কানটা জ্বলছিল তখনো তীব্র যন্ত্রণায়। রক্ত শুকিয়ে রয়েছে—তাঁর গালে, জামায়, কাপড়ে লাল হয়ে; চোখ চাইতেই তিনি চমকে উঠলেন। চারপাশে গাঢ় অন্ধকার আর তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের অশ্রান্ত গর্জ্জন। এবং লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণসর্প যেন ফণা উদ্যত ক'রে তাঁকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে এ কি আর্ত্তনাদ! এ কি

য়ঙ্কর রূপ! তাঁর মনে হ'তে লাগল এ কোথায় তিনি এসে পড়েছেন? কোথায় লুকোবেন? ভয়ার্ত্ত ও ব্যাকুল ভাবে যেদিকে তাকান সেই দিকেই সমুদ্র, সেই এক রূপ। সেই নির্জ্জন দ্বীপের মাঝে শিশুপুত্রটিকে নিয়ে তিনি একা। এ কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাগলের মত চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'রক্ষা করো, রক্ষা করো' ব'লে। কিন্তু হায়, কে কার কথা শোনে? রাণীমার সেই চীৎকার তখন সমুদ্র-গর্জ্জনের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল। ডাকাতদের নৌকোটাও দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল কোন্ অলক্ষ্যে।

ডাকাতরা যে দ্বীপটার মধ্যে রাণীমাকে ছেড়ে দিয়ে গেল তার নাম 'মৃত্যু-দ্বীপ'। সেখানে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। সমুদ্রের মত ভয়ানক ভয়ানক হাঙ্গর, কুমীরের আড্ডা সেখানে। তাছাড়া বড় বড় অসংখ্য গাছ ও নিবিড় অরণ্য চারিধারে। কত যে ভীষণ বন্যজন্তুর বাসা তার কন্দরে কন্দরে, তা কেউ জানে না। মানুষ ভয়ে সেখানে পা দেয় না। হিংস্র জন্তুদের খাস-মহল সেটা। তারা বিনা বাধায় নিশ্চিত আরামে সেখানে পরিভ্রমণ করে। ডাকাতরা তাই যখন সুবিধে পায় নিজহাতে মানুষকে হত্যা না ক'রে সেই দ্বীপটায় ফেলে দেয়। কত হতভাগ্যের শেষ নিশ্বাস যে জড়িয়ে আছে সেই দ্বীপের প্রতি বৃক্ষলতায়, প্রতি ধূলিকণায়, তা কে নির্ণয় করতে পারে?

কতকগুলো মানুষের কঙ্কাল ও মাথার খুলি এখনো ছড়িয়ে আছে সেইখানে। চলতে গিয়ে কয়েকটা রাণীমার পায়ে লাগল। ছেলেকে বুকে চেপে ধ'রে কাঁপতে কাঁপতে তিনি দু'এক পা ক'রে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

কিন্তু পথ কই? যেদিকে চোখ যায় সেদিকে শুধু ভীষণ জঙ্গল, আর রাশি রাশি কালো জমাট অন্ধকার। হঠাৎ একটা আলো দেখে তিনি চম্‌কে উঠলেন। তাঁর সামনে বনের মধ্যে মনে হ'লো যেন জ্বলছে সেই আলোটা। বুকে তাঁর ক্ষীণ আশার সঞ্চার হ'লো। তিনি মনে করলেন হয়ত কোন আশ্রয় মিলতে পারে সেখানে। তাই দুরু দুরু বক্ষে ধীরে ধীরে তিনি যেতে লাগলেন সেই দিকে।

এমন সময় চিক্‌মিক্ ক'রে আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। চোখের সামনে অনেক দূর পর্য্যন্ত তিনি দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। এ কি! এ তো আলো নয়, এ যে কি একটা কালোমত জন্তুর প্রকাণ্ড জ্বলন্ত চোখ! চীৎকার ক'রে উঠে ছুট্‌তে ছুট্‌তে প্রাণভয়ে তিনি সামনে একটা গাছ দেখতে পেলেন এবং কোন রকমে উঠে পড়লেন তার ওপর। একে মেয়েমানুষ, তাতে বড়লোকের বৌ, গাছে কেমন ক'রে উঠতে হয় কোনদিন জানেন না। কিন্তু তবুও যে দুর্ব্বার শক্তি, যে অসমসাহসিকতার বলে মানুষ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও তার অমূল্য জীবনকে রক্ষা করবার জন্য দেহের প্রতি শোণিতবিন্দুতে প্রতি শিরায়-উপশিরায় আকস্মিক বল ও বৈদ্যুতিক প্রেরণা অনুভব করে, রাণীমাও আজ সেই শক্তি, সেই প্রেরণা অনুভব করলেন। আত্মরক্ষার ইচ্ছা মানুষকে যে কী ক'রে নিমেষে সমস্ত কাজের উপযুক্ত ক'রে তোলে তা রাণীমা এই প্রথম বুঝলেন। তিনি যে কোনদিন কোনও অবস্থায় গাছে চড়তে পারবেন তা বোধ হয় একদিন আগেও স্বীকার করতেন না। জামা-কাপড় ছিঁড়ে, হাত-পা কেটে-ছড়ে রক্ত পড়তে লাগল, কিন্তু

তবুও তিনি ক্ষান্ত হ'লেন না, ছেলেটিকে পিঠের সঙ্গে কাপড় দিয়ে বেশ ক'রে বেঁধে হাঁপাতে হাঁপাতে গাছের ওপর উঠে বসলেন।

চন্দ্র ও নক্ষত্র বিহীন আকাশ তখনো থেকে থেকে বিদ্যুতের কশাঘাতে শিউরে উঠছিল। মধ্যরাত্রির সুগভীর নিস্তব্ধতা চারিদিকে—অরণ্যে, বৃক্ষের শাখায়-প্রশাখায়, আকাশে-বাতাসে, সেই দ্বীপভূমির প্রতি ধূলিকণাতে। শুধু মাঝে মাঝে সমুদ্রের গর্জ্জনে সেই অরণ্য যেন দারুণ যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠছিল। পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে রাণীমা তাই শুনছিলেন।

ভোর হ'লো। প্রভাতের অস্পষ্ট আলোকে রাণীমা সেই স্থানের বীভৎস রূপ দেখে শিউরে উঠলেন। বিজন বন, নানাজাতীয় ছোট বড় গাছপালায় সমাচ্ছন্ন ; কোথাও কোন মনুষ্যবসতির চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। গাছপালার ফাঁক দিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বনের পর বন, জঙ্গলের পর জঙ্গল। উঠে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে চাইতেই তিনি আরও অবাক হয়ে গেলেন, দূরে অনন্ত অকূল সমুদ্র আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। ডানদিকে দেখলেন, বাঁদিকে দেখলেন, সেই এক দৃশ্য।

ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। এ কোথায় এসে পড়লেন ? আবার তিনি তাকালেন—এক হাত দিয়ে গাছের কয়েকটা ডালপালা সরিয়ে ভাল ক'রে দেখতে লাগলেন। সমুদ্র সেখান থেকে খুব কাছে। কয়েকটা গাছপালার পরেই খানিকটা বালুময় তীর এবং তারপরই সমুদ্র। কিন্তু ও কি ! তিনি চম্‌কে উঠলেন। পোড়া কাঠের মত কালো কালো অনেকগুলো কি বালির ওপর শুয়ে আছে এবং এক একটা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। তখনি তাঁর বুক কেঁপে উঠলো এবং বুঝতে বাকী রইল না যে, সেগুলো আর কিছু নয়, বড় বড় কুমীর।

সেই সময় আবার খস্ খস্ ক'রে নীচে কি শব্দ হ'লো। তিনি তাড়াতাড়ি নীচের দিকে চাইলেন—তাঁর মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল ; দেহের রক্ত হিম হয়ে গেল। তিনি দেখলেন একটা আশ্চর্য্য রকমের মোটা সাপ শুকনো পাতার ওপর দিয়ে চলে গেল।

একটু পরেই ফ্যাঁ—ফ্যাঁ—ফ্যাঁ, বুক্—বুক্—বুক্, উঃ—উঃ—উঃ প্রভৃতি বিচিত্র রকমের আওয়াজ আসতে লাগল তাঁর কানে। কোনটা আসছে গাছের মাথা থেকে, কোনটা বা বনের ভেতর থেকে, কোনটা বা দূর বনান্তের অস্পষ্টতার মধ্যে থেকে। এমন অদ্ভুত শব্দ তিনি আর কখনো শোনেন নি। তাই যতই এই সব শুনতে লাগলেন ততই তাঁর বুক শুকিয়ে যেতে লাগল। বনের এই অপূর্ব্ব নীরবতা এবং বিচিত্র মুখরতা একসঙ্গে তাঁকে অভিভূত ক'রে ফেললে। কি করবেন, কি না করবেন, কিছুই তিনি ভেবে পেলেন না। শুধু সভয়ে দিনের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে রইলেন।

সকাল হ'লো, দুপুর হ'লো, বিকাল হ'লো, আবার রাত্রির অন্ধকারও নেমে এল। কিন্তু তবুও তিনি গাছের ওপর থেকে নীচে নামতে পারলেন না ; তাঁর সাহস হ'লো না।

ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যেতে লাগল, তবুও ভয়ে তিনি সেখান থেকে এক পা নড়লেন না। একটা মোটা গাছের ডালে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। হয়ত সেখানে কোন

লোকের দেখা পাবেন, হয়ত ভগবান তাঁর প্রতি মুখ তুলে চাইবেন, এই ছিল তাঁর মনে একান্ত বিশ্বাস। কিন্তু হায়! সে বিশ্বাসও ক্রমশঃ তাঁর হারাল।

মানুষ কিছু না খেয়ে কত দিন থাকতে পারে? তাই এই ভাবে দুদিন কেটে যাবার পর যখন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাঁর সারা দেহ অবশ হয়ে পড়লো এবং অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁর প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে উঠলো, তখন আর তিনি চুপ ক'রে সেখানে বসে থাকতে পারলেন না। কাপড় ছিঁড়ে গাছের ডালে একটা দোলা তৈরী করলেন এবং ছেলেটিকে তাতে শুইয়ে দিয়ে অতি কষ্টে ডাল বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে এলেন। তারপর খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে বনের মধ্যে চলতে লাগলেন।

কোথায় পথ? কোন্ দিকে যেতে হবে তিনি কিছুই জানেন না। তাই এক পা ক'রে যান, আর একবার ক'রে পিছন দিকে ফিরে তাকান। এইভাবে অল্প দূর যাবার পর হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো একটা গাছে কতকগুলো ফল পেকে রয়েছে। নীচে বিস্তর ঝোপঝাড় ও জঙ্গল দেখে মনে ভয় হ'লো। কেমন ক'রে যাবেন সেখানে? কিন্তু পেটের জ্বালায় স্থির থাকতে পারলেন না, তাই আপাতত ক্ষুধা নিবারণ করবার একটা জিনিস নিকটে দেখতে পেয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন তাঁর পা সেই দিকে চলতে লাগল।

কাছাকাছি যেতেই তাঁর মনে আশার সঞ্চার হ'লো। তিনি দেখলেন গাছের কয়েকটা ডাল একেবারে তাঁর মাথার ওপরে ঝুলছে। হাত বাড়িয়ে তিনি একটা ডাল টেনে ধরলেন এবং অপর হাতে ফল পাড়তে লাগলেন। একটা ফল পেড়ে যেমন আর একটা ধরবার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন, অমনি একটা কালো মিশমিশে সাপ পাতার মধ্যে থেকে ফোঁস্ ক'রে তাঁর হাতে একটা ছোবল মারলে।

উঃ—মাগো, ব'লে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহটা একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা ও কঠিন হয়ে গেল।

এইভাবে রাণীর মৃত্যু হ'লো এক অজ্ঞাত অখ্যাত জঙ্গলের নিভৃত অন্তরে! কেউ দেখলে না, কেউ জানলে না, কেউ কাঁদলে না। কোন্ নরখাদক হিংস্র জন্তু যে সেই মৃতদেহটাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে টানতে টানতে কোথায় নিয়ে গেল কে জানে!

হায় রে অদৃষ্ট! তখনো শিশুসন্তানটি জানে না, কত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল সেই মুহূর্ত্তে তার জীবনে। গাছের ডালে প্রস্ফুটিত ফুলের মত সে তখনো হাওয়ায় দোদুল্যমান সেই কাপড়ের দোলাটিতে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। হয়ত বা তার মনে হচ্ছিল সে শুয়ে আছে তার মায়ের বুকে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তার ঘুম ভাঙলো এবং সে স্বপ্ন ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে কেঁদে উঠলো চীৎকার ক'রে। দুপুরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে সেই শিশুপুত্রটির অসহায় ক্রন্দন-ধ্বনি ধ্বনিত হ'তে লাগল সেই নির্জ্জন অরণ্যে।

এক শ্রেণীর অসভ্য বর্ব্বর জাত মাত্র সেই দিন এসেছিল সেই বনে, যাদের মানুষ বলা বিড়ম্বনা মাত্র। যদিও তাদের দেহটা মানুষের মত—দু'টো হাত, দু'টো পা, চোখ মুখ নাক কান সবই আছে

মানুষের মত, তবুও তাদের মানুষ বলতে গেলে মনে ভয় হয়। কি জানি পাছে আমরাও সেই দলের মধ্যে পড়ে যাই!

রাক্ষসের বংশধর বোধ হয় তারা—নগ্ন, উলঙ্গ দেহ, শুধু কৌপীন আঁটা, তাও বাঘ, ভাল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর চামড়ায়। জন্তু-জানোয়ারের কাঁচা মাংস ও রক্ত তাদের প্রিয় খাদ্য। কালো মিশমিশে রং, বিরাট দেহ, বড় বড় দাঁত, ছোট ছোট চোখ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গলায় জাবজন্তু ও মানুষের মাথার খুলি—হারের মত ঝুলছে। হাতে, পায়ে, মাথায়, কোমরে সর্ব্বাঙ্গে—জীবজন্তুর হাড়, দাঁত ও পালকের অলঙ্কার। তারা হিংস্র জন্তুর চেয়েও ভয়ানক, বাঘের চেয়েও দুর্দ্ধর্ষ। তারা শিকারী, কৌশলে শিকারকে হত্যা করে এবং গা থেকে চামড়া, দাঁত, হাড় খুলে নিয়ে ব্যবহার করে। কখনো কাঁচা মাংস খায়, কখনো বা আগুনে ঝলসে খায়। তাই গভীর জঙ্গলে, দুরারোহ পর্ব্বতচূড়ায়, তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে তারা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কখনো বাঘ ভাল্লুক ধরে, কখনো কেউটে গোখরো অজাগর ধরে, কখনো বা ধরে কুমীর হাঙ্গর। অরণ্য দেখলেই তারা চিনতে পারে—তার প্রতি লতাপাতা, প্রতি ঝোপঝাড়, প্রতিটি অলিগলি তাদের পরিচিত। তারা তার গন্ধে সচকিত হয়ে ওঠে,—বুঝতে পারে কোথায় কোন্ জন্তু-জানোয়ার লুকিয়ে আছে। তাই আগে থেকে সাবধান হয়ে সেইদিকে অগ্রসর হয়। অরণ্য তাদের পদস্পর্শে শিউরে ওঠে; তারা অরণ্যের শত্রু। ডাকাতের মত লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যায় তার যথাসর্ব্বস্ব। তাই এই ভয়ানক স্থানে, 'মৃত্যুদ্বীপে' আসতে তাদের বুক কাঁপে না, তারা ভয় পায় না; যদিও কতবার কত লোক প্রাণ হারিয়েছে সেই দ্বীপের হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হাতে।

বেলা তখন দুপুর হবে। সূর্য্যের প্রদীপ্ত আলোতে তারা বেরিয়েছিল সাপ ধরতে। একটা জঙ্গল থেকে আর একটা, এ গাছ থেকে ও গাছ, এমনি ভাবে ঘুরে ঘুরে তারা সাপ ধরছিল। সঙ্গে ছিল তাদের অদ্ভুত রকমের ঝুড়ি, এক-একটা ক'রে সাপ ধরে আর তার মধ্যে পুরে শক্ত ক'রে দড়ি দিয়ে বাঁধে। এমনি ভাবে সাপ ধরতে ধরতে ভাগ্যক্রমে তারা একেবারে এসে পড়লো সেই গাছটার কাছে।

হঠাৎ একটা শিশুর কান্না শুনে তারা সকলে চমকে উঠলো। এই বিজন অরণ্যে কোথা থেকে এলো শিশু! মানব-শিশু! তবে কি তাদের মত আর কোন দল এসেছে সেখানে? এই মনে ক'রে তারা খুঁজতে লাগল কোন্ গাছের ওপর থেকে শব্দটা আসছে। এ গাছ ও গাছ দেখতে দেখতে তাদের নজরে পড়লো একটা গাছের ডালে সুন্দর এক টুকরো কাপড়ের দোলা বাঁধা এবং তারি মধ্যে থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে।

দৌড়ে একজন সেই গাছটায় উঠে পড়লো এবং ওপর থেকে ছেলেটিকে নামিয়ে নিয়ে এলো।

এই রকম গভীর বনে এমন সুন্দর একটি ফুটফুটে ছেলে এবং তার সুন্দর বেশভূষা দেখে তাদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। এরকম গভীর অরণ্যে যে অন্য কোন ব্যক্তি আসতে পারে, এ ছিল তাদের ধারণার অতীত। তাই কোথা থেকে এবং কেমন ক'রে সেই ছেলেটি এখানে এলো, তাই নিয়ে

তারা অনেক মাথা ঘামালে এবং বনের মধ্যে অনেক খোঁজাখুঁজি করলে, কিন্তু কোথাও কারো চিহ্ন দেখতে পেলে না।

শেষে ছেলেটিকে নিয়ে তারা চলে গেল। গাছের ওপর থেকে ছেলেটিকে যে পেড়ে এনেছিল, সে-ই তার শিকারকে দাবী করলে; এবং অপর সকলে বিনা বাধায় তাকেই সেটা দিয়ে দিলে। সে ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে তার বৌকে দিলে। এইভাবে জমিদার ইন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্র, ঘোষাল বংশের কুলতিলক মানুষ হ'তে লাগল সভ্যতার স্পর্শবর্জ্জিত বন্য এক নারীর কাছে।

অবশ্য ছেলেটিকে মানুষ করবার জন্যে তারা নিয়ে যায় নি। তারা ভেবেছিল, মন্দ কি, এমন সুন্দর একটা জিনিস, হয়ত চড়া দামে বিক্রী হবে, বন্য জীবজন্তুর সঙ্গে। যাই হোক, যা তাদের মনে থাকুক না কেন, সেই মা-হারা ক্ষুধার্ত্ত শিশুটি বহুক্ষণ পরে এক জঙ্গলী রমণীর স্তন্যপান ক'রে যেন নূতন জীবন আবার ফিরে পেলে।

কেঁদে কেঁদে তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, ভাল ক'রে আওয়াজ বেরুচ্ছিল না। এইবার আবার নতুন ক'রে তার কণ্ঠে এলো বল। আবার সে প্রাণপণে চীৎকার ক'রে তার জীবনীশক্তির পরিচয় দিতে লাগল।

বীভৎস চেহারা ও সম্পূর্ণ অপরিচিত মূর্ত্তি দেখে সে রীতিমত কান্নাকাটি শুরু ক'রে দিলে। অতটুকু শিশু, সেও যে তার মায়ের জন্য চীৎকার করছে, এ বুঝতে সেই জঙ্গলী রমণীটির কিছুমাত্র বাকী রইল না। তাই কোলে ক'রে, মাথায় ক'রে, এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি ক'রে, এটা-ওটা দেখিয়ে সে তাকে ভোলাতে লাগল।

প্রথম প্রথম দু-একদিন শিশুটি খুবই কান্নাকাটি করলে, কিন্তু তাতে কোন ফল হ'লো না। সে তার মায়ের সেই সদাহাস্যময়ী অতি পরিচিত মুখখানি যখন আর দেখতে পেলে না, তখন বাধ্য হয়ে চুপ করলো এবং বর্ত্তমান অবস্থাটাকেই মেনে নিলে। সেই জঙ্গলী মায়ের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আবার শিশুটি হাসলো, আবার হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করতে লাগল।

এইভাবে তিন-চার মাস কেটে গেল। একজন দু'জন ক'রে যখন অনেকগুলি লোক প্রাণ হারালে সেইখানে, সেই বন্য জন্তু-জানোয়ারের হাতে, তখন তারা সেই স্থান ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলে গেল। এই নিয়ম তাদের, যখনি দলের লোক কমে আসে, তখনি আর কালবিলম্ব না ক'রে তারা সব সরে পড়ে সেখান থেকে।

তারা ভবঘুরে বেদের জাত। আজ এখানে আছে, কাল আবার যায় এক নতুন জায়গায়। তাদের কোন নির্দ্দিষ্ট ঘরবাড়ী নেই, কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নেই। যখন যেখানে থাকে তখন সেই স্থানটিকে নিজস্ব মনে করে। আগুন জ্বালিয়ে, ঘাস লতা পাতা দিয়ে ছাউনি তৈরী ক'রে তারা বাস করে। তীর-ধনুক, বর্শা-বল্লম এই হ'লো তাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র।

এখান ওখান ক'রে আরো কিছুদিন কাটাবার পর তারা গিয়ে হাজির হ'লো নেপালের কাছে

এক দুর্গম জঙ্গলে। চারিদিকে দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়, মাঝখানে বন—বিরাট বন, নিবিড় বন, তার আদি নেই, অন্ত নেই। কঠিন হিমালয়ের পাষাণ বক্ষ জুড়ে ধীর, স্থির, অচল, অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কত যুগ-যুগান্তর ধ'রে যে কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ প্রাণী—ক্ষুদ্র, বৃহৎ, হিংস্র, অহিংস্র তার বৃক্ষে, লতায়, পাতায়, শাখায়-প্রশাখায় আশ্রয় ক'রে আছে তা কে জানে! মানুষ যখন জন্মায় নি, সৃষ্টির সেই আদিম যুগ থেকে বোধ হয় এমনি ক'রেই দাঁড়িয়ে আছে এই হিমালয় আর এই অরণ্য। বৃদ্ধা প্রকৃতির বৃদ্ধ সন্তান তারা। মানুষের আগে তারা জন্মেছে—তারা এসেছে এই পৃথিবীতে। তারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ, তাদের থেকেই এসেছি আমরা—এই মানুষ।

প্রথমে ছিল এই পৃথিবীতে শুধু জল আর জল—অনন্ত, অগাধ, অসীম। তারপর এলো পাহাড়, পর্ব্বত, আগ্নেয়গিরি, মরুভূমি—এলো মাটি। তারপর জন্মালো উদ্ভিদ—বৃক্ষ-লতার শ্যামলতায় ভ'রে উঠলো প্রকৃতির বুক। তারপর সৃষ্টি হ'লো প্রাণ—জীবনের প্রথম পরিস্ফুরণ। মৎস্য, জলচর জীব, পশুপক্ষী, উভচর, সরীসৃপ, অতিকায় জন্তু এবং তা থেকেই অবশেষে মানুষ। এই হ'লো বিবর্ত্তন—পৃথিবীর জানোয়ার সৃষ্টির ধারা—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছরের ক্রমবিকাশ; মানবজন্মের ইতিহাস।

কে বলতে পারে সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যের রহস্য? কে জানে কত শত প্রাণীর আশ্রয় সেখানে? ক্ষুদ্র, বৃহৎ, হিংস্র, ভয়াল কত জীবজন্তু তার মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে যে জন্মাচ্ছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে তা কে বলতে পারে? তাই সে বিরাট অরণ্যের মধ্যে এসে অসভ্য বর্ব্বর শিকারীরা যেন দিশাহারা হয়ে গেল। এই বনে তারা ইতিপূর্ব্বে কখনো আসে নি। এখানকার অরণ্য, গিরগুহা, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা সব তাদের কাছে নতুন—অপরিচিত। তাই এক অতি বৃহৎ পাহাড়ের পাদদেশে অপেক্ষাকৃত বৃক্ষ-বিরল স্থানে অতি সন্তর্পণে তারা গিয়ে আস্তানা গাড়লে। কাঠকুটো এলো, লতাপাতা এলো, তারা আবার নবোদ্যমে লেগে গেল বাসা বাঁধতে।

ওদের পুরুষরাও কাজ করে, মেয়েরাও কাজ করে। ক্ষমতায়, দৈহিক বলে পুরুষের চেয়ে নারী কম যায় না। মেয়েরা কাঠ কাটে, লতাপাতা সংগ্রহ করে, আর পুরুষরা আহারের জন্য শিকারের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে। তারা বাস করে দল বেঁধে, তাদের ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ নির্ভর করে দলপতির ওপর। তার আদেশেই ওরা ওঠে বসে। তারি হাতে ওদের দৈনিক কর্ম্মপদ্ধতি।

নতুন অরণ্য, নতুন স্থান। এর গাছপালা, পশুপক্ষী, পথঘাট সবই তাদের অজানা, অচেনা।

প্রথম দিনই মেয়েরা গেল লতাপাতা কাঠকুটো সংগ্রহ করতে। কেউ গাছ কাটে, কেউ লতাপাতা সংগ্রহ করে, কেউ তাদের ঘাড়ে ক'রে বয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন বনে যায়, একা যায় না, তাদের শিশুসন্তানগুলোকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়। পিঠের সঙ্গে কাপড়ে ছেলেকে বেঁধে নিয়ে তারা কাজ করে। কখনো বা ভারী কাজ করবার সময় গাছের ডালের ওপর ছেলেদের শুইয়ে রাখে, তারপর যাবার সময় আবার তাদের পিঠের ওপর পুঁটলির মত ক'রে বেঁধে নিয়ে চলে যায়।

জমিদারের পুত্র, যার খাট-পালঙে শুয়ে দাসদাসীদের সেবা-শুশ্রূষায় দিন কাটাবার কথা, সে

এখন জঙ্গলীদের সঙ্গে পিঠে ক'রে বাহিত হচ্ছে, বন থেকে বনান্তরে। এই তার অদৃষ্টের লেখা! কে তা খণ্ডাবে?

প্রথম দিনই হ'লো এক বিপদ। তার জঙ্গলী মা কাঠ কাটতে কাটতে তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে নিকটবর্ত্তী এক জলাশয়ে জলপান করতে গেল। কিন্তু ফিরে এসে দেখলে সেখানে তার ছেলে নেই, গাছের গুঁড়ির উপর যেখানে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গিয়েছিল সে-স্থান শূন্য! কে নিলে? কোথায় গেল? সে চীৎকার ক'রে সঙ্গীদের ডাকলে, তারা সবাই ছিল নিজেদের কাজে ব্যস্ত—এখানে, ওখানে, সেখানে। গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে তারা ছুটে এলো এবং কাছাকাছি বনজঙ্গলগুলোয় খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু বৃথা হ'লো তাদের পরিশ্রম; ব্যর্থ হ'লো সকল চেষ্টা। শেষে তারা গিয়ে খবর দিলে পুরুষদের।

তারা এলো তীর-ধনুক, বর্শা-বল্লম নিয়ে। নতুন জায়গায় এসে প্রথমেই পড়লো তাদের কাজে বাধা। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে শেষে তারা সিদ্ধান্ত করলে তাকে বাঘেই ধরে নিয়ে গেছে। কোথায় কোন্ ঝোপঝাড়ে হয়ত লুকিয়েছিল, একটু ফাঁকা পেয়েছে আর তুলে নিয়ে পালিয়েছে। বাঘেদের আক্রমণ এমনি অতর্কিত-ই বটে। এমনি ক'রে যাকে একদিন বন থেকে তারা কুড়িয়ে পেয়েছিল, তাকে আবার বনেই হারিয়ে তারা চলে গেল সেইখান থেকে। কেউ মুহূর্ত্তের জন্যও ভেবে দেখলে না সেই দুগ্ধপোষ্য পদ্মফুলের মত সুন্দর শিশুপুত্রটির কি ভীষণ অবস্থা হ'লো সেই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে। আশ্রিতের জন্য একবারও তাঁদের বুক কাঁপল না, একবারও মনের মধ্যে তারা শূন্যতা অনুভব করলে না। তাদের হৃদয়ে মায়া নেই, মমতা নেই। বন্যার স্রোতের মত তারা এসেছিল, আবার বন্যার স্রোতের মত তারা চলে গেল।

নিবিড় অরণ্য তেমনি নিবিড় রইল। কত রহস্য, কত অভাবনীয় ঘটনা যে ঘটতে লাগল তার শাখা-প্রশাখার অন্তরালে, তার প্রশান্ত নীরবতায়, তা তারা বুঝতেও পারলে না, জানতেও পারলে না। তারা এসেছিল শিকার করতে, চলে গেল শিকার ক'রে—রক্তের স্রোত বইয়ে, মৃত্যুর বান ডাকিয়ে। প্রাণীহত্যার প্রচণ্ড নেশায় যখন তারা উন্মত্ত, ঠিক সেই সময় এক ছায়াছন্ন বননিবিড় পর্ব্বত-গুহায় এক বীভৎস বনমানুষের কোলে সেই জমিদার-শিশুটি। সে কাঁদছে আর তাকে থামাবার জন্য সেই বনের পশুটির কি অক্লান্ত পরিশ্রম! সে একটা মিষ্টি পাকা ফল টিপে টিপে তার মুখে রস দিচ্ছে আর শিশুটি জিব বার ক'রে চেটে চেটে কখনো তাই খাচ্ছে, কখনো বা কাঁদছে। বনের এক প্রান্তে সংহার, অপর প্রান্তে স্থিতি। একদিকে হত্যা-হানাহানি; অপরদিকে সংরক্ষণ—একজন আর একজনের জীবন রক্ষা করছে। মানুষ হত্যা করছে পশুকে, আর পশু রক্ষা করছে মানুষকে। যেমনি অদ্ভুত, তেমনি অভাবনীয়! আমরা সুসভ্য মানুষ, তাই এখন আমাদের একথা ভাবতে কেমন কেমন লাগে।

পশুর হৃদয়ে মায়া আছে, মমতা আছে। তাদেরও আছে পুত্র-কন্যা। তারাও মানুষের মত শিশুদের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখে, দূর-দূরান্তর থেকে খাদ্য আহরণ ক'রে এনে তাদের খাওয়ায়; পাছে

তাদের কোন কষ্ট হয়, তারা কোন বিপদে পড়ে এই ভয়ে সর্ব্বদা তাদের সাবধানে রক্ষা করে। তাদের দুঃখে মা-বাপের অন্তরে ব্যথা লাগে। তাই যখনি তারা কাঁদে বা কোন বিপদে পড়ে, বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে থাকে তৎক্ষণাৎ ছুটে যায়। বিশেষতঃ বনমানুষ, তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি খুব বেশী। মানুষের ঠিক পূর্ব্বপুরুষ নাকি তারা, অন্তত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডারউইন তাই বলেন। তাদের অস্থির সঙ্গে মানুষের অস্থির মিল আছে। দৈহিক গঠনেও তারা প্রায় মানুষের মত; তফাতের মধ্যে তাদের দেহে বড় বড় লোম। আর তারা কথা কইতে পারে না মানুষের মত। কিন্তু তা হ'লেও তাদের একটা ভাষা আছে, তা দিয়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা কয়। আমরা তা বুঝতে পারি না, কিন্তু তারা পারে।

গাছের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঝুলতে ঝুলতে তারা ছুটে চলে। গাছের মাথা, গাছের ডালপালা হ'লো তাদের পথ, তাদের বেড়াবার জায়গা। তাই যেখানে গাছপালা বেশী, সে-স্থানে থাকতে তারা ভালবাসে।

বনমানুষরা বাস করে দল বেঁধে। তারা একজন আর একজনকে যেমন ভালবাসে, তার বিপদে ছুটে যায়, তেমনি আবার হিংসা করে, তার সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি করে। এমন কি এক-এক সময় ঝগড়া এমন তুমুল হয় যে, একজন আর একজনকে মেরে ফেলে। তখন আসে তাদের সর্দ্দার। তাকে তাদের সবাই ভয় করে এবং তার কথা সবাই মেনে নেয়। সে কাউকে কঠিন শাস্তি দেয়, কাউকে ক্ষমা করে এবং কখনো কখনো আপসে মীমাংসা ক'রে শান্তিস্থাপন করে। যার গায়ে জোর বেশী, যে ভাল যুদ্ধ-কৌশলী, তাদের মধ্যে থেকে সেই হয় সর্দ্দার। তাকে ভোট দিয়ে নির্ব্বাচন করতে হয় না, আপনার বাহুবলে সে আপনার প্রভুত্ব আপনি স্থাপন ক'রে নেয় এবং দলের মধ্যে তার স্থান হয় সবার ওপরে। খিচাঙ্ হ'লো এই দলের সর্দ্দার। তার স্ত্রী মিয়াঙ্গী বনে ঘুরতে ঘুরতে সেই ছেলেটাকে দেখতে পায় এবং চুপি চুপি তাকে নিয়ে পালিয়ে আসে।

স্ত্রীর কাণ্ড দেখে খিচাঙ্ ভারী রেগে গেল। কোথা থেকে একটা সাদা রঙের অদ্ভুত ছেলে সে কুড়িয়ে নিয়ে এলো! সে অনেক বকাবকি করলে, গালাগালি দিলে এবং মিয়াঙ্গীকে তখনি সেটা ফেলে দিয়ে আসতে বললে। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হ'লো না। তার দুটো ছেলে হয়েছিল, দুটোই মরে গেছে; সে এখন নিঃসন্তান। তাই স্বামীর কথা শুনে সে এমন ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল যে, খিচাঙ্ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হ'লো এবং তার স্ত্রীকে আর কিছু বললে না। পশু হলেও মাতৃত্বটা মানুষের চেয়ে তার কোন অংশে কম ছিল না। মিয়াঙ্গী তাই সেই সম্পূর্ণ অজানা অচেনা শিশুটাকে বুকে চেপে ধরলে এবং পাকা পাকা ফল এনে তাকে খাওয়াতে লাগল।

অন্যান্য বনমানুষরা পর্যন্ত মিয়াঙ্গীর ওপর চটে গেল। কোন্ একটা অদ্ভুত জানোয়ারকে ধরে এনে সে এত আদিখ্যেতা করছে! নিজের জাত ছেড়ে, নিজের কুল ছেড়ে সে নিয়ে এলো কিনা এক অজানা অচেনা পশুকে! রাগে তাদের সর্ব্বশরীর জ্বলতে লাগল এবং সর্দ্দারকে পর্য্যন্ত তারা বহু ধিক্কার দিলে। পুরুষমানুষ হয়ে, দলপতি হয়ে সেও এই সব সহ্য করলে—নারীর কথায় সায় দিলে? সর্দ্দারের ওপর তাদের জন্মালো ভারী অশ্রদ্ধা।

খিচাঙ্‌ তাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, আরে তোমরা ঘাবড়াচ্ছ কেন ? আমাকে কি এতই বোকা পেলে, আমি কি বুঝি না কিছু ভেবেছ ? কিন্তু কি করবো, মেয়েমানুষ তায় নিজের পরিবার যদি অনবরত কান্নাকাটি করে, আর বায়না ধরে তো কি করতে পারি ! পর পর দুটো ছেলে মরে গিয়ে বেচারী অনেক শোক পেয়েছে। তাই মনে করলুম, থাক না ওই নূতন জিনিসটাকে নিয়ে ভুলে। আমাদের ত আর তাকে দেখতে শুনতে হচ্ছে না। তাকে সে নিজেই খাওয়ায়, পরায়, কোলে ক'রে নিয়ে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়, ফুল পেড়ে দেয়, কত আদর করে, কত যত্ন করে। আরে সে তো রইল আমাদের হাতের মুঠোর ভেতর—তাকে মেরে ফেলতে কতক্ষণ! দিনকতক থাক না; মিয়াঙ্গী ততক্ষণ একটু শোক ভুলুক তাকে নিয়ে। তারপর আমিও রইলুম, আর তোমরা তো রইলে।

সর্দ্দারের কথা শুনে তারা তখনকার মত ক্ষান্ত হলো বটে, কিন্তু ছাইচাপা আগুনের মত ভেতরে ভেতরে তারা গুম্‌রে মরতে লাগল; মুখে প্রকাশ করলে না।

মিয়াঙ্গী বুঝতে পেরেছিল যে, সেই ছেলেটিকে উপলক্ষ্য করেই রীতিমত একটা অশান্তি দেখা দিয়েছে তাদের দলের মধ্যে এবং বেশীর ভাগ লোক দেখতে পারে না তাকে আর তার এই পালিত ছেলেটিকে। সবারই চক্ষুশূল হয়েছে তারা, শুধু সর্দ্দারের দাপটে কেউ কিছু ক'রতে পারে না। তা না হ'লে সেই শিশু-সন্তনটির জীবনলীলা কবে শেষ হয়ে যেতো।

একদিন রাত্রে সবাই ঘুমুচ্ছে এমন সময় ঘিসুঙ চুপিচুপি এসে ছেলেটিকে চুরি ক'রে নিয়ে সবে পালাতে যাবে অমনি ট্যাঁ ক'রে সে কেঁদে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে মিয়াঙ্গী এমন জোরে একটা ঘুঁষি মারলে তার নাকে যে, তার নাক ভেঙ্গে ঝরঝর ক'রে রক্ত পড়তে লাগল এবং বিকট চিৎকার করতে করতে সে বেচারী অন্ধকারের মধ্যে ছুটে পালাল। পরদিন সকালে কথাটা দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং কে যে এ কাজ করেছে তার ভাঙ্গা নাক দেখে সবাই বুঝতে পারলে। তখন একজনের এই শাস্তি দেখে দলের অন্য সবাই খুব সাবধান হয়ে গেল।

মিয়াঙ্গী অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে মানুষ করতে লাগল ছেলেটিকে। সে সর্ব্বদা তাকে চোখে চোখে রাখে; কখনো একলা ফেলে কোথাও যায় না। যদি কোথাও যাবার দরকার হয় তো অতি বিশ্বাসী, কোন আত্মীয়স্বজনের কাছে তাকে রেখে তবে সে স্থান ত্যাগ করে। কিন্তু একটা কথা মিয়াঙ্গী কিছুতেই ভেবে পায় না এবং এই নিয়ে স্ত্রী-বনমানুষ বিশেষতঃ যারা ছেলের মা তাদের সঙ্গে প্রায়ই সে আলোচনা করে। বারো-তেরটা চাঁদ চলে গেল তবুও কেন তার ছেলেটি গায়ে যথেষ্ট বল পেলে না, বেশ শক্ত হয়ে উঠলো না। এতদিন তো তাদের নিজের জাতের ছেলেমেয়েরা বেশ বলিষ্ঠ ও সবল হয়ে ওঠে, নিজেরা নিজেদের আহার সংগ্রহ করে, গাছে গাছে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। এই নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অবধি রইল না। গাছে গাছে, ডালে ডালে সে ছেলেটিকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কখনো তার হাত দুটো ডালের ওপর ধরিয়ে দিয়ে তাকে ঝুলিয়ে দেয়, কখনো বা খাবারের জন্য ফলের গাছ তাকে দেখিয়ে দেয় এবং রোজ ভাবে এইবার বোধহয় ছেলেটি সব চিনেছে,

এইবার বোধ হয় সে নিজে থেকেই করতে পারবে সব। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, তার আশা মেটে না কিছুতেই।

অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তাকে নিরাশ ক'রে দেয়। তারা বলে, ওটা একটা অদ্ভুত জানোয়ার জড়ভরত; ওর দ্বারা কোনদিন কিছুই হবে না।

খিচাঙ্ রেগে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে আমি বার বার বলছি ও কিছুতেই আমাদের মত বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় বনমানুষ হ'তে পারে না, ওকে ছেড়ে দাও, ওকে ফেলে দাও, কিন্তু কিছুতেই তোমার চৈতন্য হ'লো না। এখনো বলছি দূর ক'রে দাও তা না হ'লে চিরকাল ভূতের বোঝা শুধু বয়ে মরতে হবে। ওর দ্বারা আমাদের জাতেরও কোনদিন কোন উপকার হবে না, তোমার নিজেরও কোনদিন কিছু হবে না। শুধু চিরকাল তাকে আগলাতে আগলাতেই তোমার প্রাণ যাবে। তার চেয়ে আমাদের জাতের কোন ছেলেকে পাললে সে তবু বুড়ো বয়সে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে।

কিন্তু মিয়াঙ্গী কিছুতেই তার স্বামীর কথায় রাজী হ'লো না। তার অন্তরের কোন্ কোমল স্থানটিতে অজ্ঞাত অপরিচিত সেই ছেলেটি আধিপত্য বিস্তার করেছিল তা কে জানে! তাই স্বামীর কথার উত্তরে সে শুধু বললে, তা হোক, যদি চিরজীবন তাকে বইতে হয় তাও ভাল, তবু আমি তাকে ছাড়তে পারবো না।

এই কথা শুনে খিচাঙের মনে ভারী রাগ হ'লো, সে বললে, আচ্ছা তুমি কেমন ক'রে সুচাঙ্কে রাখতে পারো দেখছি। সুচাঙ্ মানে 'সাদা-চামড়া'। তাই তারা সেই ছেলেটির নাম দিয়েছিল সুচাঙ্।

কিন্তু খিচাঙের মুখ থেকে এই কথা শোনা মাত্র তার স্ত্রী মিয়াঙ্গী তাকে শাসিয়ে বললে, দেখো আমার পেছনে যদি তোমরা সকলে এরকম ক'রে লাগো তো ঠিক জেনো একদিন তোমাদের দলবল ছেড়ে সুচাঙ্কে নিয়ে কোনদিকে পালাবো। এখনো বলছি আমাকে জ্বালাতন করো না; এই ছেলেটিকে নিয়ে শান্তিতে থাকতে দাও।

বনের পশু হলেও তাদের মধ্যে ছিল নিয়মানুবর্ত্তিতা, রীতি-নীতি, শৃঙ্খলা ও সামাজিকতার জ্ঞান। তাই কেউ দল ছেড়ে যদি অন্য কোথায় চলে যায় বিশেষতঃ মেয়েছেলে, তো তাদের বংশের, তাদের জাতের একটা কলঙ্ক। তার ওপর মিয়াঙ্গী নামকরা সুন্দরী। তার বয়স অল্প, হাতের পায়ের নখগুলো সুন্দর এবং বেশ ছিপছিপে সুডৌল দেহ, তাই তাকে হারানোর কথা চিন্তা করতে শুধু খিচাঙের কেন সমস্ত দলের লোকের বুকে ব্যথা লাগল; কাজেই তারা আর সুচাঙের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবে না স্থির করলে। যা হবার হোক্ তার জন্যে সুচাঙের মা মিয়াঙ্গী বুঝবে।

সুচাঙ্ মানুষ, তাই সে বনমানুষের মত অল্পদিনেই সাবালক হয়ে উঠে ছুটাছুটি করতে পারলো না, বাড়তে লাগল অতি ধীরে ধীরে। কিন্তু যখন তার মাত্র দশ বছর বয়স সে এমন সুন্দরভাবে গাছ বাইতে লাগল এবং এমন অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রীড়া-কৌশল দেখাতে লাগল যে, তার সমবয়সী বনমানুষরা তো ভেবেই পেলে না কেমন ক'রে সে এই সব করে।

তাদের সঙ্গে সুচাঙের প্রভেদ ছিল অনেক এবং অনেক সময় তারা অবাক হয়ে যেতো সুচাঙের এই বুদ্ধির উৎকর্ষতা দেখে। কিন্তু দৈহিক বল ও চেহারায় তাদের চেয়ে সুচাঙ্ ছিল অনেক নীচুতে। দশ বছর বয়সে তাদের চেহারা হয় পরিপূর্ণ এবং লম্বায় কেউ কেউ ছ'ফুটেরও ওপরে যায়। আর সে জায়গায় দশ বছর বয়সে সুচাঙ ত কেবলমাত্র বালক। কিন্তু বালক হ'লে কি হয়, অতি শৈশব থেকেই সে তার পশু-মায়ের দেখাদেখি গাছের ডাল ধরে ধরে লাফাতে শিখেছে এবং যত তার বয়স বাড়তে লাগল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এইভাবে ডালের উপর দিয়ে যাতায়াত অভ্যাস শুরু করলে। তার সমবয়সীদের সঙ্গে এইভাবে চলাফেরা করতে করতে ক্রমশঃই সে এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠলো যে, একটা গাছ থেকে আর একটা গাছের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান তাও সে একলাফে স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যেতো। আর তা ছাড়া একটা গাছের মাথা থেকে দুই লাফে একেবারে সে নীচে নেমে আসতো; আবার দুই লাফে যে-কোন উঁচু গাছের একদম মাথার ওপরে চড়ে বসতে পারতো।

সুচাঙের বয়স এখন দশ বছর বটে, কিন্তু যে-কোন তিরিশ বছরের যুবকের চেয়ে বেশী বলবান, বেশী ক্ষমতা তার দেহে এবং যে-কোন বড় খেলোয়াড়ের চেয়ে সে বেশী তৎপর ও বেশী ক্রীড়া-কুশলী। এইভাবে যত দিন যেতে লাগল ততই তার দেহে বাড়তে লাগল বল ও ক্ষমতা।

এই ভয়-ভীষণ হিংস্র জানোয়ারদের মধ্যে সে ছিল মনের আনন্দে। কারণ, অন্য কোন জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। এমন কি ভাবতে পর্য্যন্ত পারতো না যে, সেই শ্বাপদসঙ্কুল অতি পরিচিত অরণ্য ছাড়া অন্য কোন স্থান পৃথিবীতে আছে।

প্রায় দশ বছর যখন তার বয়স তখন থেকেই সে বুঝতে পারলে যে, তার দেহের সঙ্গে তার সঙ্গীদের দেহের অনেক প্রভেদ আছে। তার মতন দেখতে তাদের নয়। তার দেহটা রোদ্দুরে পুড়ে পুড়ে তামাটে মেরে গিয়েছিল। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে তার লজ্জা বোধ হ'লো; তার মনে হ'তে লাগল তার দেহে বড় বড় লোম নেই; সে নিতান্তই নগণ্য সাপ বা সরীসৃপের মত।

সে তখন করলে কি, কতকগুলো কাদামাটি নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে মাখলে। মনে করলে তা হ'লেই তাকে বনমানুষদের মত দেখাবে, কিন্তু সেগুলো যেই শুকিয়ে গেল অমনি ঝরে ঝরে পড়তে লাগল তার দেহ থেকে। এতে সুচাঙের ভারী বিশ্রী বোধ হতে লাগল এবং সে স্থির করলে তার চেয়ে লোমহীন দেহে থাকা ঢের ভাল। তাই আর সে-চেষ্টা করলে না।

খুব উঁচুতে পাহাড়ের ওপর একটা জঙ্গলে বনমানুষেরা দল বেঁধে প্রায়ই বেড়াতে যেতো। সেখানে একটি ছোট জলাশয় ছিল; তারি স্বচ্ছ জলে সুচাঙ্ প্রথম দেখলে তার মুখের চেহারা।

তারপর গরমকালে আবার একদিন সুচাঙ্ তার এক খুড়তুতো ভাইকে সঙ্গে নিয়ে চুপিচুপি গেল সেখানে জল খেতে। যেই তারা দুজনে জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে মুখ নীচু করেছে অমনি দু'টি মুখ একসঙ্গে পাশাপাশি ফুটে উঠলো। আয়নার মত সেই স্থির ও স্বচ্ছ জলের ওপরে সুন্দর ফুটফুটে একখানি মুখের পাশে কুৎসিত ও বীভৎস আর একখানি বনমানুষের মুখ!

সুচাঙ্‌ রীতিমত শিউরে উঠলো। তার এই লোমহীন দেহ আর নেহাত গো-বেচারীর মত ছোট মুখ দেখে সে ভেবেই পেলে না কেমন ক'রে এখনো তার বনমানুষ ভাইয়েরা তার মুখের দিকে তাকায়।

এই ছোট, এক ফোঁটা মুখ, পাতলা নাক এবং ছোট্ট ছোট্ট সাদা দাঁত। কি বিশ্রী দেখায় তাকে ভায়েদের পাশে! তারা কি ভাগ্যবান্! ইয়া বড় বড় মুখ, ইয়া পুরু পুরু ঠোঁট, লম্বা লম্বা দাঁত, মুখের প্রায় অর্দ্ধেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে প্রকাণ্ড মোটা নাক। কি সুন্দর, কি পরিষ্কার তাদের দেখতে!

এই কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো নিজের চোখের ওপর। সে অভিভূত হয়ে গেল নিজের চোখ দেখে। কি সুন্দর তার চোখ—কালো রঙের রেখা চারিদিকে গোলাকার, তার মাঝখানে একটা কালো স্থান এবং তারপর অবারিত শুভ্রতা—সাদা ধবধবে রঙ!

নিজের চেহারার কথা চিন্তা করতে করতে সে এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে, শুনতেই পায় নি তার পিছনে জঙ্গলের মধ্যে খস্‌ খস্‌ ক'রে কিসের একটা শব্দ হচ্ছে এবং চুপিচুপি বনের ভেতর দিয়ে কে সেই দিকে এগিয়ে আসছে। এমন কি তার সঙ্গীর কানেও কোন শব্দ গেল না, কারণ সে তখন জিব দিয়ে চক্‌চক্‌ ক'রে এমন ভাবে জলপান করছিল এবং মুখের মধ্যে জল নিয়ে এমন একটা বিশ্রী আওয়াজ করছিল যে, তার সেই শব্দে পিছনের সেই ধীর ও সতর্ক পদশব্দ ডুবে গেল।

তাদের পিছনে বোধ হয় হাত তিরিশেক দূরে দাঁড়িয়ে থেকে বিরাট একটা সিংহী লেজ নাড়ছিল এবং লক্ষ্য করছিল তাদের দু'জনকে। অতি সাবধানে কোন শব্দ না ক'রে একটা থাবার ওপর আর একটা থাবা ফেলে সে এগিয়ে আসছিল, লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে। তার পেটটা খুব ঝোলা—মনে হচ্ছিল যেন লুটিয়ে চলেছে মাটিতে। সে চলছিল ঠিক যেমন ক'রে বিড়াল শিকারের ওপরে লাফিয়ে পড়বার জন্যে ওৎ পেতে চলে সেই ভাবে। আরো দু'চার পা অগ্রসর হয়ে সে লেজটা নাড়া বন্ধ করলে এবং সেটা একদম পেছনে খাড়া ক'রে রাখলে।

এক মুহূর্ত্তের জন্য সিংহীটা যেন পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, তারপর ভীষণ গর্জ্জন ক'রে দিলে এক লাফ।

সিংহীরা খুব বুদ্ধিমান শিকারী। তারা জানে জঙ্গলের পশুপক্ষীদের কি তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি এবং কি বিদ্যুৎগতি! সামান্য শব্দে তারা সচকিত হয়ে ওঠে, পাতার আওয়াজে তারা পিছন ফিরে তাকায়। তাই চুপিচুপি আরো কাছে এগিয়ে যাওয়া একেবারে যুক্তিযুক্ত নয় ভেবেই সিংহীটা সেইখান থেকে সগর্জ্জনে লাফ দিলে। কারণ, আরো কাছে গেলে হয়ত গায়ে ঘাস লেগে আওয়াজ হবে—শিকার ফস্‌কে যেতে পারে। কিন্তু তাদের গর্জ্জন শুনে অনেক সময় ভয়েই শিকারীর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, হাত-পা জমে যায়, কি করবে ভেবে পায় না এবং অধিকাংশ স্থানেই তারা সাফল্যলাভ করে।

কিন্তু সুচাঙের বেলা তা হ'লো না। সে এখন বন্যপশুর মত হ'লেও মানুষের সন্তান বটে। মানুষের রক্ত, মানুষের বুদ্ধি তার শিরায়-উপশিরায়, তার প্রতি শোণিতবিন্দুতে। বন্যপশুদের সঙ্গে থেকে থেকে সে শিখেছিল আত্মরক্ষা করবার ক্ষিপ্রতা এবং মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি তাকে দিয়েছিল

উৎকৃষ্টতর চিন্তাশক্তি যা একেবারে বনমানুষদের ধারণার সম্পূর্ণ বাইরে। তাই সিংহীর গর্জ্জন শোনবামাত্র তার দৈহিক ও মানসিক বল উভয়েই একত্রে কাজ শুরু করলে।

তার সামনেই ছিল গভীর জল এবং পিছনে নিশ্চিত মৃত্যু। যদিও এর আগে সে কোনদিন জলে নামেনি। জলকে সে ভয় করতো, ঘৃণা করতো এবং তেষ্টা না পেলে কোনদিন সে জলের ধারে ঘেঁষতো না। তবুও আজ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আর কিছু চিন্তা করবার আগেই সে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলের মধ্যে।

সুচাঙ্‌ সাঁতার জানতো না বটে, কিন্তু তার মনে ছিল অগাধ সাহস। তাই সে গভীর জলের মধ্যে পড়ে কেবল হাত-পা ছুঁড়তে লাগল এবং ওপরে উঠবার জন্য অনবরত চেষ্টা করতে লাগল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই তার দেহটা ভেসে উঠলো জলের ওপর এবং সে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল যে ডাঙ্গা থেকে ততক্ষণে সে অনেক দূরে চলে এসেছে। তাই আর একবার ডুব দিয়ে আবার সেইভাবে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেল। তখন তার ভারী মজা লাগল। সে করলে কি, কুকুরেরা জলের মধ্যে পড়ে যেমন করে, সেইভাবে মাথাটা উঁচু ক'রে সামনে ও পিছনে হাত-পা ক্রমাগত ছুঁড়তে লাগল এবং দেখতে দেখতে একেবারে ওপারে গিয়ে হাজির হ'লো।

এইভাবে সে শিখলে সাঁতার এবং তার এই নতুন অভিজ্ঞতার জন্য একসঙ্গে বিস্ময় ও আনন্দ অনুভব করলে। কিন্তু তখন আর তা নিয়ে মাথা ঘামাবার তার সময় ছিল না। সে চেয়ে দেখলে, ওপারে তার সঙ্গীর দেহ ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। সিংহীর মুখে তখনো ঝরছে রক্ত এবং সে আবার তার দিকে তাগ করতে করতে এগিয়ে আসছে ও লেজ নাড়ছে ঘন ঘন।

সুচাঙের মনে এইবার ভারী ভয় হ'লো। সে তখন চীৎকার ক'রে উঠলো। সে এক অদ্ভুত ডাক! সে এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর! গাছে-গাছে, পাতায়-পাতায়, বনে-বনে সে ডাক ধ্বনিত হতে লাগল। অরণ্য, বৃক্ষলতা, পর্ব্বতের পাষাণ বক্ষ পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো সেই শব্দে। বিপদের সেই সঙ্কেতধ্বনি শুনে তার আত্মীয়স্বজনরা যে যেখানে ছিল চমকে উঠে সেইদিকে ছুটলো।

সকলের প্রথমে সে-ডাক কানে গেল সুচাঙের মা মিয়াঙ্গীর। সে আর কালবিলম্ব না ক'রে ছুটলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বনমানুষরাও তার পিছু নিলে। তারাও সকলে শুনতে পেয়েছিল সেই ডাক এবং তাদের সবাই বুঝতে পেরেছিল যে, দলের কেউ কোন ভীষণ বিপদে পড়েছে। পঞ্চাশ-ষাটজন একসঙ্গে চীৎকার ক'রে তাকে সাড়া দিলে এবং গাছের ডালপালা ভেঙ্গেচুরে লাফাতে লাফাতে, দুলতে দুলতে, ছুটতে ছুটতে তারা সবাই চললো সেই দিকে।

সকলের প্রথমে ছিল মিয়াঙ্গী। সে বুঝতে পেরেছিল তার প্রাণপ্রিয় সুচাঙ্‌ বিপদে পড়েছে। তার পিছনেই ছিল আর একজন যার ছেলে সুচাঙের সঙ্গে গিয়েছিল এবং যাকে হত্যা করেছে সেই সিংহীটা। সেই বনমানুষের দলকে সেখানে আসতে দেখে সিংহীটা গোঁ গোঁ ক'রে উঠলো এবং মাটিতে লেজের ঝাপটা মারতে মারতে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল।

সুচাঙ্‌ তখন সাঁতার কেটে এসে একেবারে ডাঙ্গায় উঠে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ যেন

তাজা হয়ে উঠলো। সে অনুভব করতে লাগল আরো সাহস, আরো তেজ, আরো আনন্দ তার দেহের শিরায়-উপশিরায়, প্রতি শোণিতবিন্দুতে। ঠাণ্ডা জলে ডুব দিয়ে স্নান করায় যে এত আনন্দ, এত আরাম তা সুচাঙ্ জানতো না। এর আগে কোনদিন পুকুরে সে স্নান করেনি বা করবার অবসর পায়নি। তাই সে যেন একটা নতুন খেলা, নতুন কাজ পেলে এবং তখন থেকে রোজ একবার ক'রে এসে সেই পুকুরে স্নান করতো এবং সাঁতার কাটতো।

বনমানুষরা জলকে পছন্দ করে না ; নেহাত কোন বিপদে না পড়লে তারা একদম নামে না সেখানে। কিন্তু আজকের এই সাঁতারের আনন্দ সুচাঙের মনে এমন একটা মধুর স্মৃতি এঁকে দিলে যে, তার পরদিন থেকে তার জীবনের একটা পরিবর্ত্তন ঘটলো। প্রত্যহ শুধু খাওয়া ঘুমানো, আর বনে বনে আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো, এই একঘেয়ে জীবনযাত্রার হাত থেকে সে নিস্তার পেলে।

সুচাঙ্ যে-দলের মধ্যে মানুষ তারা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। বনমানুষ হ'লেও তারা ঠিক একই জায়গায়, একই জঙ্গলে বেশীদিন থাকতে ভালবাসতো না। যখন যে জঙ্গলে থাকতো তখন তার দশ-বারো মাইল জায়গার মধ্যে তারা ঘুরে বেড়াতো এবং সেই পর্য্যন্ত থাকতো তাদের গণ্ডী সীমাবদ্ধ— সেই তাদের রাজত্ব।

দশ বছর, বারো বছর, কখনো বা দু'এক বছর পরে তারা সেই স্থান পরিত্যাগ ক'রে আবার অন্য কোন নতুন জঙ্গলে চলে যেতো এবং এই সমস্তই অর্থাৎ যাওয়া না-যাওয়া নির্ভর করতো সর্দ্দারের ওপর। তাছাড়া তারা দেখতো সেখানকার জল-হাওয়া ভাল কিনা, খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পাওয়া যায় কিনা এবং হিংস্র জন্তু যারা তাদের শত্রু বা যারা তাদের চেয়ে বেশী বলবান, তারা কি পরিমাণে অনিষ্ট করে তাদের। আবার কখনো কখনো এমন খেয়াল হ'তো যে, তারা বেরিয়ে পড়তো দল বেঁধে ; হয়ত দু'দিন তিনদিন ক্রমাগত ঘুরতো—এ-বন, ও-বন, সে-বন।

রাত্তির যখন যেখানে হয় তখন সেখানে ঘুমোয়। তারা অন্ধকারে গড়াগড় শুয়ে পড়ে মাটিতে, শুকনো পাতায় সমস্ত দেহ ঢেকে—নাক, কান, মাথা, চোখ, মুখ। একজন আর একজনের হাতে মাথা দিয়ে শোয়। এইভাবে শীতের দিনে তাদের দেহ উষ্ণ হয়ে ওঠে এবং তারা বেশ আরাম বোধ করে। সুচাঙ্ অবশ্য বারো-মাস এই রকম ক'রে মিয়াঙ্গীর হাতে মাথা রেখে ঘুমোয়—এ তার বরাবরের অভ্যাস।

হিংস্র পশু হ'লেও সেই বিরাট বনমানুষটি সুচাঙ্‌কে ভালবাসতো প্রাণ দিয়ে, পশুহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে। আর মানুষ হ'লেও সুচাঙ্ ভালবাসতো সেই বিকট লোমশ জানোয়ারটিকে একান্ত আন্তরিকভাবে ; তার সত্যিকারের মা বেঁচে থাকলে ঠিক যতখানি ভালোবাসতো ঠিক তেমনি ভাবে। কারণ সে তো জানতো না কে তার আসল মা, কে তার নকল মা। তাই সে ঢেলে দিয়েছিল নির্ব্বিচারে সন্তানের বুকের সবটুকু স্নেহ—সবটুকু ভালবাসা সেই পশুমায়ের চরণে।

অবাধ্য হ'লেই মিয়াঙ্গী তাকে বকতো, চড় মারতো, শাস্তি দিতো, কিন্তু কখনো কোন নির্দ্দয় বা নিষ্ঠুর ব্যবহার করতো না সুচাঙের প্রতি।

মিয়াঙ্গীর স্বামী খিচাঙ্ দু'চক্ষে দেখতে পারতো না সুচাঙকে। কেবল সে লুকিয়ে লুকিয়ে সুযোগ খুঁজতো তাকে মেরে ফেলবার। কিন্তু আশ্চর্য্য! মানুষ হোক্ বা পশু হোক কেমন ক'রে জানি না ঠিক বুঝতে পারে কে তাকে সত্যিসত্যি ভালবাসে, আর কে ভালবাসে না। সুচাঙ্ তাই খিচাঙের প্রতি ঠিক সেই রকম ব্যবহার করতো। সুবিধে পেলেই সে লেগে যেতো তার পেছনে এবং নানাভাবে তাকে অপমান করতে চেষ্টা করতো; এই সব দুষ্টুমি সে করতো কখনো বা মায়ের কোলের মধ্যে থেকে আর কখনো বা বড় বড় গাছের ডালের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে।

হাজার হোক্ সে হ'লো মানুষ, তার বুদ্ধির কাছে খিচাঙ্ বন্যপশু পারবে কেন? ছোটখাটো নানারকম কৌশলে সে একেবারে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলতো খিচাঙকে।

সুচাঙ ছেলেবেলা থেকে শুক্‌নো ঘাস ও লতাপাতা পাকিয়ে এক রকমের দড়ি তৈরী করতে শিখেছিল। গাছের ওপর থেকে মাঝে মাঝে সে লুকিয়ে লুকিয়ে সেই দড়িগাছটা খিচাঙের গলায় লাগিয়ে তাকে ঝুলিয়ে দেবার চেষ্টা করতো এবং অনবরত সেই দড়িটা নিয়ে খেলা করতে করতে সে একদিন হঠাৎ শিখে ফেললে এক রকমের ফাঁস তৈরী করতে। তার সঙ্গী ছোট ছোট বনমানুষের ছেলেমেয়েরাও সেই ফাঁস নিয়ে তার সঙ্গে টানাটানি ক'রে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করতো। সুচাঙ্ যা করবে তাদেরও তাই করা চাই।

একদিন হ'লো কি, এইরকম খেলা খেলতে খেলতে হঠাৎ সেই ফাঁসটা একটা ছোট ছেলের গলায় লেগে গেল। সে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল, কিন্তু এমনভাবে সেটা শক্ত হয়ে তার গলায় আটকে গেল যে, সে বেচারা আর এক পা-ও নড়তে পারলে না সেখান থেকে।

সুচাঙ্ দেখলে, বা রে, বেশ মজা ত! সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে তখন দড়িটা নিয়ে বার বার অভ্যাস করতে লাগল সেই ফাঁসটা।

বেচারী খিচাঙ্ তো ভয়ে অস্থির। কি জানি কখন সুচাঙ্ এই ফাঁসটা তার গলায় গলিয়ে দেবে—আর সে অক্কা পাবে! তাই সে ঘুমুতে পারত না যেখানে সেখানে—সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত তার ভয়ে।

এর জন্য সুচাঙের মা তাকে তিরস্কার করলে, খিচাঙ্ বার বার তাকে ভয় দেখিয়ে শাসালে এবং আর যারা যারা সুচাঙকে দেখতে পারতো না তারা বিশেষভাবে তাকে সতর্ক ক'রে দিলে; কিন্তু তবুও কিছুতেই কিছু হ'লো না।

সুচাঙ্ তাদের কাউকে গ্রাহ্য করলে না। তার সেই সরু দড়িটা নিয়ে সে বার বার তাদের ভয় দেখাতে লাগল। দলের মধ্যে যারা যারা ছিল পাজী বদমায়েস, তাদের গলায় সুচাঙ্ সেই ফাঁসটা লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। আর তাই দেখে অপর বনমানুষগুলোর কি স্ফূর্ত্তি। ঠিক হয়েছে, কেমন জব্দ! এই ব'লে তারা মনে মনে খুব হাসতো আর সুচাঙকে ধন্যবাদ দিতো।

কারণ সেই পাজী জানোয়ারগুলো অকারণে ভারী কষ্ট দিতো তাদের দলের অপর বনমানুষগুলোকে। তাদের গায়ে ক্ষমতা বেশী ব'লে যাকে তাকে যখন তখন আঁচড়ে কামড়ে মেরেধরে একেকার করতো। তাই সেই অত্যাচারী বদমায়েসগুলো যে সুচাঙকে ভয় করে এই দেখে তাদের মনে ভারী আনন্দ হ'লো। তারা সুচাঙের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব করলে এবং গোপনে গোপনে তাকে উত্তেজিত করতে লাগলে তাদের বিরুদ্ধে।

তখন সুচাঙের মনে নানা রকমের চিন্তা ঘুরতে লাগল। সে ভাবলে যখন সে ফাঁস দিয়ে তার দলের লোকদের ধরতে পারে তখন কেন সেই সিংহীটাকেই বা ধরতে পারবে না! সিংহীটা তার ভাইকে হত্যা করেছে এবং তাকেও হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ধরতে পারেনি—বড় জোর প্রাণে বেঁচে গেছে!

এই চিন্তাটা বার বার তার মনে ওঠানামা করতে লাগল এবং ভবিষ্যতে একদিন সত্যিসত্যিই কাজে পরিণত হ'লো। কেমন ক'রে তা পরে বলছি।

হঠাৎ একদিন তারা সদলবলে বেরিয়ে পড়লো বেড়াতে। কোন্ পথে যাবে, কোন্ দিকে যাবে কিছুই তাদের জানা নেই। শুধু তারা বেরুল ঘুরতে নিরুদ্দেশের পথে। তাদের মনে যেন জাগল, ভবঘুরে বন্যপশু তারা, তারা বেরিয়ে পড়লো ঘর ছেড়ে। একদিন গেল, দু'দিন গেল, তখনো তারা চলছে ক্রমাগত; তাদের পথ আর ফুরোয় না—এ-বন থেকে ও-বন, ও-বন থেকে সে-বন। দুর্ভেদ্য অরণ্যে, দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশিখরে, সুদীর্ঘ বৃক্ষের শাখায়-প্রশাখায় তাদের উল্লাস, তাদের আনন্দ কেঁপে কেঁপে চললো। অকস্মাৎ এক জায়গায় গিয়ে বনমানুষের দলটি থমকে দাঁড়ালো। তারা স্থির করলে সেখানে সবাই বিশ্রাম নেবে। তাই কেউ গাছের ডালে, কেউ পর্ব্বতগুহায়, কেউ বা দীর্ঘ ঘাসে ঢাকা বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলে। আর তখনি কয়েকজন ছুটলো আহার্য্য সংগ্রহ করতে।

সুচাঙ্ এখন বড় হয়েছে; সে তার মার কাছে বায়না ধরলে, সেও যাবে দাদা ও কাকাদের সঙ্গে খাবার সংগ্রহ করতে। মিয়াঙ্গী তাকে নিষেধ করলে—দুদিন ক্রমাগত হেঁটে হেঁটে হয়ত তার গায়ে ব্যথা হয়েছে তাই বিশ্রাম করতে বললে; কিন্তু সুচাঙ্ তার মার কথা শুনলে না, তাকে অনুরোধ করতে লাগল; তার কৌতূহলী মন এটা ওটা সেটা দেখবার জন্য তখন বড়ই ব্যস্ত। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিয়াঙ্গী তাকে যাবার অনুমতি দিলে।

সুচাঙ্ এখন ভারী চঞ্চল ও ভারী দুরন্ত হয়েছে। কখন এক ফাঁকে যে সে তার সঙ্গীদের কাছ থেকে অন্য দিকে চলে গেল তা তারা কেউ জানতে পারলে না। একা একা কিছুদূর যাবার পর সে দেখলে একটা উঁচু পাহাড়ের তলায় অল্প কয়েকটা গাছ এবং তার নীচে লতাপাতা দিয়ে তৈরী ছোট্ট একটা তাঁবুর মত ঘর। ঘর এর আগে সুচাঙ্ কখনো দেখেনি। তাই অবাক হয়ে সেই জিনিসটা সে দেখতে লাগল। চারিদিকে ঘুরেফিরে দেখলে, আরো কয়েকটা সেই রকম জিনিস সেখানে ছিল কিন্তু এখন ভেঙ্গেচুরে ছড়িয়ে পড়ে আছে। তার ভারী কৌতূহল হ'লো। সে একটু উঁকিঝুঁকি মেরে

আস্তে আস্তে সেই চালাটার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। তারপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে লাগল সেই ঘরটি। কতকগুলো জন্তুর কঙ্কাল ও দু'একটা হরিণের শিঙ ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে হাতে ক'রে সেইগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে যখন বেরিয়ে আসতে যাবে ঘর থেকে তার পায়ে কী যেন একটা ফুটলো। সে 'উঃ' ক'রে উঠলো এবং তাড়াতাড়ি পায়ের তলায় হাত দিয়ে দেখলে ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড়ছে আর ছোট ছোরার মত কী একটা অস্ত্র পোঁতা রয়েছে মাটির মধ্যে।

সুচাঙ্ মাটির মধ্যে থেকে সেটাকে টেনে তুলে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। সেটা কী, কোন্ কাজে লাগে আর কেমন করেই বা তৈরী করে সে কিছুই জানত না এবং এর আগে কোন দিনও তা দেখে নি। তাই সেই অস্ত্রটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে ভাবতে লাগল এটা কী! আস্তে আস্তে হাতের একটা আঙুল দিয়ে যেই সে তার কাদা পরিষ্কার করতে গেছে অমনি তার আঙুলটা দিয়ে আবার রক্ত পড়তে লাগল। তখন সুচাঙ্ বুঝতে পারলে যে সেটা আর যাই হোক খুব ভাল জিনিস নয় এবং সেটা মানুষের গায়ে লাগলে ব্যথা লাগে ও শরীর থেকে রক্ত পড়ে। তাই এমন অদ্ভুত বস্তুটিকে সঙ্গীদের দেখাবার জন্য সে হাতে করে নিয়ে গেল।

বনের দিকে সবে সে এগিয়েছে, মাত্র কুড়ি কি পঁচিশ পা, এমন সময় হঠাৎ তার সামনে একটা ছোট ঝোপ থেকে উঠে দাঁড়ালো বিরাটকায় এক মূর্ত্তি। প্রথমে সুচাঙ্ মনে করেছিল বুঝি সেই জন্তুটি তার নিজের জাতের কেউ হবে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তার সে ভুল ভাঙ্গল; সে তখন বুঝতে পারলে সেটা একটা বিরাট গরিলা।

সুচাঙ্ তখন তার এত কাছে এসে পড়েছিল যে, সেখান থেকে তার পালাবার আর কোন উপায় নেই। সে জানতো যে, গরিলা বনমানুষের ভীষণ শত্রু এবং তার হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে এখুনি হয়ত তার জীবন বিপন্ন হবে। কিন্তু তবুও তার সেখান থেকে পালাবার কোন উপায়ই ছিল না। বনমানুষদের মত বলিষ্ঠ ও দীর্ঘদেহ হলে হয়ত সুচাঙ্ তার সঙ্গে যুঝতে পারতো কিন্তু সে নেহাতই মানুষ, অল্পবয়স্ক ও কিশোর। তাই এই হিংস্র জানোয়ারের সামনে তাকে দেখাচ্ছিল পুতুলের মত ক্ষুদ্র ও নগণ্য। যদিও তার শিরায় উপশিরায় ছিল বীরের সাহস ও রক্ত এবং তার সমস্তটা বাল্য ও কৈশোর কেটেছে বনেজঙ্গলে হিংস্র জানোয়ারদের মধ্যে এবং ভয় কাকে বলে সে জানতো না, তবুও এই দুঃসাহসিক কাজের কথা চিন্তা ক'রে তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

গরিলাটা হাঁ ক'রে তাকে আক্রমণ করতে এলো। সুচাঙ্ ঘুঁষি মারতে লাগল তার পেটে। কারণ, তার চেয়ে ওপরে আর সে নাগাল পেল না। তখনো তার একটা হাতে সেই ছুরিটা ধরা ছিল। শেষে যখন গরিলাটা তাকে নির্দ্দয়ভাবে আক্রমণ করলে—আঁচড়ে, কামড়ে তার ঘাড়ের ওপর পড়ে ধস্তাধস্তি করতে লাগল তখন সুচাঙ্ সেই ছোরাটা দিয়ে বারকতক তার পেটে আঘাত করলে।

গরিলাটা যন্ত্রণায় দারুণ চীৎকার ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো; তার দেহ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে রক্ত পড়তে লাগল। সুচাঙ্ ছোরাটার বাঁট পর্য্যন্ত চালিয়ে দিলে তার বুকের মধ্যে।

গরিলাটা চীৎকার ক'রে তার গলায় একটা থাবা মারলে এবং খানিকটা মাংস ছিঁড়ে বার

করে নিলে সেখান থেকে। তারপর আর তার হাত-পা চললো না—অবশ হয়ে এলো। কাঁপতে কাঁপতে তার সারা দেহ স্থির হয়ে এলো এবং বিরাট পাহাড়ের মত সে আছড়ে পড়লো সেখানে। এইভাবে গরিলাটার মৃত্যু হ'লো।

আর ওদিকে তারই পাশে সুচাঙের ক্ষতবিক্ষত দেহ অচৈতন্য হয়ে মাটিতে লুটোতে লাগল।

এক মাইল দূর থেকে গরিলার সেই হুঙ্কার বনমানুষগুলো শুনতে পেয়েছিল। কারো সঙ্গে যে একটা ভীষণ যুদ্ধ চলেছে তা বুঝতে তাদের কিছুমাত্র বাকী রইল না। সঙ্গে সঙ্গে খিচাঙ্ করলে কি, তার দলের সকলকে একে একে গুনে ফেললে এবং যখন দেখলে সুচাঙ ছাড়া আর সকলেই আছে সেখানে, তখন সে চুপ ক'রে রইল—ভাবটা এই যে যদি সে এইভাবে মরে যায় তো আপদ যায় এবং সে বিষয়ে আরো অনেকেই খিচাঙের সঙ্গে একমত হ'লো। কিন্তু মিয়াঙ্গী,—যে তাকে মাতৃস্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছে সে আর চুপ করে থাকতে পারলে না। সুচাঙকে দেখতে না পেয়ে একাই চুপিচুপি তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন সবে নামছে ধীরে ধীরে—বনের ওপরে, গাছের মাথায়, ঝোপঝাড়ের অন্তরালে। গাছের ডালে ডালে লাফাতে লাফাতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটলো মিয়াঙ্গী আর তার পেছনে পেছনে দু'একজন তার একান্ত অনুগত সহচর।

অন্ধকারে ভাল করে কিছু দেখা যায় না। তাই সুচাঙ্ সুচাঙ্ বলে ডাকতে ডাকতে তারা বনের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কিন্তু সুচাঙ্ তখন অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, সাড়া দেবার ক্ষমতা তার নেই; তাই তারা চারদিকে হাতড়াতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ আকাশে চাঁদ উঠলো এবং তারি জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়লো গাছের ফাঁকে ফাঁকে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে মধ্যে; আর সেই অস্পষ্ট আলোতে মিয়াঙ্গীর নজরে পড়লো একটা বিরাট কালো মত কী পড়ে আছে মাটিতে। তার কাছে যেতেই সে চমকে উঠলো, দেখলে সেটা একটা প্রকাণ্ড গরিলা, রক্তাক্ত কলেবরে মরে পড়ে আছে। তারপর এদিক ওদিক আর একটু অনুসন্ধান করতেই দেখতে পেলে একটা গাছের নীচে শুকনো পাতার স্তূপ এবং তার ওপরে শুয়ে আছে সুচাঙ্ নির্ব্বাক ও জ্ঞানশূন্য; তখনো গলা দিয়ে, বুক দিয়ে, হাত দিয়ে, কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে ঝরঝর ক'রে।

মিয়াঙ্গীর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো। সে ভাবলে সুচাঙ্ বুঝি মরে গেছে। সে তার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে নাকের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অনুভব করতে লাগল নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা। তখনো বেঁচে আছে দেখে তারা সকলে মিলে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে ফিরে গেল বাসায় এবং চোখে মুখে মাথায় জল দিয়ে, নানারকম গাছগাছড়া লতাপাতা একেবারে তার ঘায়ের উপর বেঁধে দিলে। ঘণ্টা দুই কেটে যাবার পর সুচাঙ্ চোখ চাইল, কিন্তু কোন কথা তখন বলতে পারলে না। ইশারা করে বুঝিয়ে দিলে কিভাবে সে হত্যা করেছে সেই গরিলাটাকে। কিন্তু তখনি ছোরাটার কথা তার মনে পড়ে গেল এবং সেটা কোথায় গেল সে জিজ্ঞেস করলে তার মাকে। ছোরাটা বরাবর তার হাতের মধ্যেই ধরা ছিল, তাই একটা অদ্ভুত রকমের রক্তমাখা জিনিস দেখে মিয়াঙ্গী সেটাকে ফেলে দেয়নি,

হাতে ক'রে নিয়ে এসেছিল। সুচাঙ্ সেটাকে চাইতেই মিয়াঙ্গী তৎক্ষণাৎ তাকে এনে দিলে। তখন তার মুখে হাসি ফুটলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মার মুখেও দেখা দিল হাসি।

কিছুক্ষণ পরে সুচাঙ্ হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল তার মাদুলিটা হাতে বাঁধা আছে কিনা। সে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না সেটাকে। তাই মিয়াঙ্গী তার হাতখানা আস্তে আস্তে উঁচু ক'রে তুলে ধরে তাকে দেখালে। মাদুলিটা দেখে সে শান্ত হ'লো এবং চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করলে।

মাদুলিটা ছিল তার প্রাণ। প্রায়ই সেটাকে নিয়ে সে নাড়াচাড়া করতো এবং শক্ত ক'রে বেঁধে রাখতো হাতের সঙ্গে। এটাকে সে মনে করতো তার অলঙ্কার এবং কিছুতেই দেহ থেকে খুলে কোথাও রাখতো না। এ সেই সন্ন্যাসী-প্রদত্ত মাদুলি যা একদিন তার গর্ভধারিণী জননী বেঁধে দিয়েছিলেন নিজে হাতে ক'রে। এই তার রক্ষাকবচ। আজ এরি বলে বুঝি সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল!

উত্থানশক্তি রহিত হয়ে সুচাঙ্ পড়ে রইল রোগশয্যায়। মিয়াঙ্গী তাকে নড়তেচড়তে দিতো না। দিনরাত তার শয্যার পাশে বসে তার শুশ্রূষা করতো, তার ঘায়ে ওষুধ লাগাতো, আহার-পথ্য এনে তার মুখের কাছে যোগান দিত। এইভাবে দু'মাস কেটে যাবার পর সুচাঙ্ বেশ সুস্থ হয়ে উঠলো এবং আবার গাছে গাছে ডালে ডালে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল।

গরিলা হ'লো বনমানুষদের শত্রু। তারা রীতিমত ভয় করে গরিলাকে। তার গায়ে ভীষণ জোর, তার ডাক শুনলে তারা শিউরে ওঠে। দৈহিক বল ও যুদ্ধবিগ্রহে তারা পেরে ওঠে না গরিলার সঙ্গে; তাই তারা লাঞ্ছিত হয়, পরাজিত হয়, ক্ষতবিক্ষত হয় এবং বেশীর ভাগ সময় মৃত্যুকে বরণ করে। সেইজন্য সুচাঙ্ একা হত্যা করেছে একটা গরিলাকে—যখন এই খবর গিয়ে মিয়াঙ্গী তার দলের মধ্যে প্রচার ক'রে দিলে তখন তাদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। তারা সেই রাত্রেই দলে দলে ছুটলো তাকে দেখতে এবং পাহাড়ের মত সেই বিরাট জন্তুটাকে রক্তাক্তকলেবরে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে তারা আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করলে। তারপর তার দেহটাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে মাংস নিয়ে লোফালুফি করতে করতে তারা বাসায় ফিরে গেল। এতটুকু-দেহ সুচাঙ্ কেমন ক'রে ওই দৈত্যের মত প্রকাণ্ড জন্তুটাকে হত্যা করলে তারা ভেবেই পেলে না। তারা মনে করলে নিশ্চয়ই সুচাঙ্ কোন দৈত্য-দানব হবে। তাই সেদিন থেকে শ্রদ্ধার চক্ষে তারা দেখতে লাগল সুচাঙকে এবং যত কিছু অন্যায় অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে তারা সব ভুলে গেল।

পুত্রের এই সম্মান ও সমাদর দেখে মিয়াঙ্গীর মনে খুব আনন্দ হ'লো এবং সেদিন থেকে তার একটা ভাবনা ঘুচলো যে আর সুচাঙকে চোখে চোখে আগলে বেড়াতে হবে না। তবে মনে বড় ভয় ছিল হয়ত দলের অপর কেউ কোনদিন তাকে মেরে ফেলবে। তাই এখন সে সগর্ব্বে ছেলেকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং যখন যেখানে খুশী তাকে একলা ছেড়ে দিতো।

আর সুচাঙের আনন্দ দেখে কে? সে যেন প্রকৃতির দুলাল। ইচ্ছামত গাছে গাছে ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায়। ঝড়, জল, রোদ্দুর, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম কিছুই গ্রাহ্য করে না। তারা যেন তার দাস,

পায়ের তলায় পড়ে থাকে। অদ্ভুত তার দৌরাত্ম্য! প্রমত্ত বিক্রমে ও প্রচণ্ড শক্তিতে সে লাফালাফি করে, ছুটোছুটি করে। বৃক্ষের শাখায়-প্রশাখায়, পত্রে-পুষ্পে কেঁপে ওঠে তার পদধ্বনি। অরণ্যের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে জেগে ওঠে মর্ম্মরধ্বনি।

ছোরাটা ছিল সুচাঙের কাছে একটা পরম বিস্ময়। সে সেটাকে নেড়েচেড়ে বার বার দেখাশুনা করে এবং সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখে। গাছের ওপর একটা ডালে সে ছোরাটাকে রাখতো লুকিয়ে। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল সেটা এমন একটা অস্ত্র যা দিয়ে যে কোন প্রাণীকে হত্যা করা যায়।

এইভাবে সুচাঙের দিন যায়। কৈশোর কেটে গিয়ে যৌবনের নব চেতনা এলো তার অস্থিমজ্জায়, শোণিতে, অন্ত্রেতন্ত্রে, দেহের প্রতি অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে। প্রাণবন্যায় তার সারাদেহ চঞ্চল হয়ে উঠলো। অস্থির হয়ে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল—নিজেকে যেন আর ধরে রাখতে পারে না। কী যেন একটা অনাস্বাদিত শক্তি, কী যেন একটা অননুভূত প্রেরণা তার অন্তরে, তার সারাদেহে। বর্ষার জলে যেমন দেখতে দেখতে নদী ভরে ওঠে কূলে কূলে, তেমনি ক'রে সুচাঙের দেহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে।

সুচাঙকে বনমানুষরা যতই মুখে শ্রদ্ধাভক্তি দেখাক না কেন, তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা আন্তরিক ঘৃণা করতো তাকে এবং তার মাকে, কিন্তু সর্দ্দারের ভয়ে মুখটি বুজে থাকতো; কাউকে কিছু বলতো না। কালাঙ্ হ'লো এই দলের মূল। সেটাকে দেখতে যেমন কদাকার তার গায়ে ছিল তেমনি জোর, কিন্তু সর্ব্বদা সে এমন ভাল মানুষ সেজে ভিজে বিড়ালের মত ঘুরে বেড়াতো যে মিয়াঙ্গী বা সুচাঙ্ কোনদিন তার অন্তরের কথা বুঝতে পারেনি বা তাকে কোন সন্দেহ করেনি।

একদিন হ'লো কি, একটা শিকারকে উপলক্ষ্য ক'রে তাদের সবাই রওনা হ'লো কোন দূরের এক বনে। মিয়াঙ্গী শুধু গেল না। সে আর তার এক সখী দুজনে রইল বাসায় তাদের শরীর অসুস্থ ব'লে।

কালাঙ্ যেন এইরকম একটা সুযোগেরই প্রতীক্ষায় এতদিন বসেছিল। সেও সেদিন তার শরীর খারাপ, পেট কামড়াচ্ছে এই ব'লে সর্দ্দারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বাসায় রয়ে গেল। অন্য সকলে দল বেঁধে চলে গেল বনান্তরে।

সন্ধ্যা হয়-হয়। সমস্ত বনভূমিতে তখন একটা ঝাপসা আবরণ। মিয়াঙ্গী একলা একটা গাছের তলায় শুয়েছিল। এমন সময় চুপি চুপি সেখানে কালাঙ্ গিয়ে হাজির হ'লো এবং সামনে পিছনে আশেপাশে একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখে একটা হাত দিয়ে সজোরে একেবারে মিয়াঙ্গীর গলাটা টিপে ধরলে। তারপর আর এক হাত দিয়ে ক্রমাগত সে তার নাকে, মুখে, মাথায় ঘুঁষি মারতে লাগল।

মিয়াঙ্গীর উপর তার ভারী রাগ। সে সর্দ্দারের স্ত্রী, তার ওপর আবার সুচাঙের মা; তারি জন্য কালাঙের দল কিছু করবার অবসর পায় না সুচাঙকে। তাই বহুদিন পরে এই সুযোগটা পেয়ে সে যেন একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠল প্রতিহিংসা নেবার জন্য।

মিয়াঙ্গী এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাই একেবারে হকচকিয়ে গেল। একলা মেয়েমানুষ কী করবে! পুরুষরা সব চলে গেছে শিকারে; তার ওপর তার সখীও তখন কী একটা কাজে গিয়েছিল কোন গাছের তলায়। কালাঙ্‌ তার গলা এত জোরে চেপে ধরেছিল যে, চেঁচাবার পর্য্যন্ত তার কোন ক্ষমতা ছিল না। কাজেই সে ছট্‌ফট করতে লাগল এবং দু'হাতের নখ দিয়ে আঁচড়ে ছিঁড়ে দিতে লাগল কালাঙের দেহ। কিন্তু তবুও কোন ফল হ'লো না। সেই বিরাট-দেহ কালাঙের হাত থেকে মিয়াঙ্গী কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারলে না।

এমন সময় সেই গাছের ওপরের ডালটা একটু দুলে উঠলো এবং দৈব-প্রেরিতের মত ঝপাৎ ক'রে একেবারে ওপর থেকে তাদের সামনে লাফিয়ে পড়লো সুচাঙ্‌। তার হাতে সেই তীক্ষ্ণধার ছোরা এবং সারা মুখে একটা অত্যুগ্র প্রতিহিংসা। কোন কথা না ব'লে এক হাতে সুচাঙ্‌ সেই ছোরাটা শক্ত ক'রে ধরলে এবং অন্য হাতে কালাঙের টুঁটি টিপে ধরে তার বুকে ঘা-কতক পর পর বসিয়ে দিলে। তীব্র আর্ত্তনাদ ক'রে কালাঙ্‌ তখনি মিয়াঙ্গীকে ছেড়ে দিলে এবং ছট্‌ফট করতে করতে রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল।

তখন তার গলার ওপর একটা পা রেখে পাথরের মূর্ত্তির মত কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে সুচাঙ্‌ চীৎকার ক'রে ডাক ছাড়লে। সে ডাক হ'লো বিপদের সঙ্কেতধ্বনি। সারা বন ধ্বনিত হয়ে উঠলো তার সেই কণ্ঠস্বরে। যে যেখানে ছিল তখনি ছুটলো সেই দিকে। তাদের আর সেদিন যাওয়া হ'লো না শিকারে। তারা সবাই দৌড়তে দৌড়তে সেখানে এসে হাজির হ'লো।

সুচাঙও তাদের সঙ্গে শিকারে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল ছোরাটার কথা। সে ভুলে গিয়েছিল সেটাকে নিয়ে যেতে, তাই চুপি চুপি আবার ফিরে এসেছিল ছোরার জন্য। কিন্তু সেখানে এসেই সে দেখলে ওই দৃশ্য—তার মায়ের ওপর সেই অত্যাচার! ঠিক যে গাছটার ওপরের ডালে সে ছোরাটা লুকিয়ে রাখে তারি নীচে। সঙ্গে সঙ্গে ছোরাটা নিয়ে সে লাফিয়ে পড়লো নীচে, সেই দুর্বৃত্তের হাত থেকে তার মাকে রক্ষা করবার জন্য।

তার ডাক শুনে যখন সবাই উপস্থিত হ'লো, তখন সুচাঙ বুকে একটা হাত চাপড়ে বললে, আমি-ই একে হত্যা করেছি, আমি এর হত্যাকারী। আজ থেকে আমি তোমাদের সর্দ্দার। তোমরা সকলে আমায় এবং আমার মা মিয়াঙ্গীকে মেনে চলবে। তোমাদের মধ্যে আরো যদি কেউ আমার শত্রু থাকে তো এইবেলা সাবধান হও। এই ব'লে আরো দুবার জোরে জোরে বুকে হাত চাপড়ে সে চীৎকার করে উঠলো।

সুচাঙের সেই মূর্ত্তি দেখে তারা সবাই অবাক হয়ে গেল।

তার মুখের ওপর কথা বলবার সাহস তখন বনমানুষদের মধ্যে আর কারো হ'লো না। তারা শুধু বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর একে একে চলে গেল যে যার বাসায়।

কালাঙের মৃতদেহ সেইখানে পড়ে রইল, কেউ তাকে স্পর্শ করলে না।

সুচাঙ্‌ ও মিয়াঙ্গী তখন সেই মৃতদেহটাকে টানতে টানতে দূরে নিয়ে গিয়ে একটা বনের মধ্যে ফেলে দিয়ে এলো।

তখন রাত হয়েছে। নিস্তব্ধ বনভূমি অন্ধকারে থমথম করছে। কোথাও কোন পশুপক্ষীর সাড়া নেই, শব্দ নেই। তারা দুজনে মা ও ছেলেতে ফিরছে বনের মধ্য দিয়ে। আগে আগে চলছে



সে দু'হাত দিয়ে তার হাঁ-করা চোয়াল দু'টো ধরে ফেললে

সুচাঙ্‌, পিছনে মিয়াঙ্গী। এমন সময় খস্‌খস্‌ ক'রে পিছনে কিসের শব্দ হ'লো। টপ ক'রে সুচাঙ্‌ গাছের ওপর উঠে পড়লো এবং তৎক্ষণাৎ তার মাকে ওঠবার জন্য বললে। কিন্তু মিয়াঙ্গী যেই গাছের ডালে হাত দিয়েছে অমনি ভীষণ গর্জ্জন ক'রে একটা বাঘ লাফিয়ে পড়লো তার ঘাড়ে। নিকটেই কোন পাহাড়ের গুহায় সে লুকিয়েছিল, তারা আগে দেখতে পায়নি।

মিয়াঙ্গী চিৎকার করে উঠলো।

সুচাঙ্‌ ছোরাটা শক্ত ক'রে ধরে একেবারে সেই বাঘটার পিঠের উপর লাফিয়ে পড়লো এবং ছোরাটা এত জোরে তার মাথায় বসিয়ে দিলে যে, সে তখনি মিয়াঙ্গীকে ছেড়ে দিয়ে গর্জ্জন করে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে এমন এক লাফ মারলে যে সুচাঙ্‌ ছিটকে পড়ে গেল।

বিরাট বাঘ!

অন্ধকারে তার চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলছে। হাঁ ক'রে সামনের পা দুটো তুলে একেবারে লাফিয়ে পড়লো সে সুচাঙের ঘাড়ে। তার একটা বিরাট থাবা তৎক্ষণাৎ সে বসিয়ে দিলে সুচাঙের

ঘাড়ে। তার একটা বিরাট থাবা তৎক্ষণাৎ সে বসিয়ে দিলে সুচাঙের হাঁটুর ওপর, আর একটা তার বুকে। ধারাল নখের আঘাতে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল এবং রক্ত পড়তে লাগল ঝর্‌ঝর্‌ করে।

সুচাঙ্‌ বাঘের সামনাসামনি দাঁড়িয়েছিল।

খপ্‌ ক'রে সে দু'হাত দিয়ে তার হাঁ-করা চোয়াল দু'টো ধরে দেখলে এবং মুখটাকে চিরে ফেলবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে দু'দিক থেকে দুটো চোয়াল টানতে লাগল।

বাঘের হাঁ-টা ক্রমশই বড় হ'তে লাগল এবং তার দু'কশ বেয়ে রক্তের ধারা ছুটলো।

একটা বিশ্রী আওয়াজের সঙ্গে তার জিভটা ঝুলে পড়লো সামনের দিকে, তারপর সে কি ধস্তাধস্তি। একদিকে সুচাঙ্‌—মানুষের সন্তান, বীর শিশু, বনমানুষের পালিত পুত্র। অন্যদিকে অরণ্যের দুরন্ত পশু, বনের তাজা বাঘ! তারা উভয়েই উভয়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে লাগল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। সমস্ত বনভূমি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তাদের গর্জ্জনে।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর সুচাঙ্‌ এক হাতে বাঘের গলাটা টিপে ধরলে এবং অপর হাতে ছোরাটা নিয়ে তার বুকে বসিয়ে দিয়ে মারলে এক টান। সমস্ত পেটটা চিরে গিয়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

মিয়াঙ্গী তখন ছুটে এসে সুচাঙকে বুকে জড়িয়ে ধরলে এবং তার দেহ থেকে রক্ত মুছিয়ে দিতে লাগল।

রাত তখন অনেক হয়েছে। ক্লান্তিতে সুচাঙের দেহ অবসন্ন হয়ে পড়লো। মায়ে-ব্যাটায় তখন আর কালবিলম্ব না ক'রে বাসায় ফিরে গেল।

পরদিন ভোর হ'তে না হ'তেই সুচাঙ্‌ ও মিয়াঙ্গী আবার সেই বনে গেল। তখনো বাঘের মৃতদেহটা সেখানে পড়ে আছে এবং কতকগুলো বন্য শৃগাল-কুকুরে ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে তার দেহ থেকে মাংস।

সুচাঙ্‌ দেখে অবাক হয়ে গেল। বাঘটা প্রায় দশহাত লম্বা হবে, কিন্তু কি সুন্দর তার রূপ! পাকা সোনার মত রঙ, তার ওপর কালো কালো ডোরা কাটা। তার ভারী ভাল লাগল। সে তখন করলে কি, মিয়াঙ্গীর কাছে আবদার ধরলে বাঘটাকে নিয়ে যাবে ব'লে। মিয়াঙ্গী তার ইচ্ছায় বাধা দিলে না। দু'জনে তখন টানতে টানতে বাঘটাকে নিয়ে গেল তাদের বাসায়। হাড়ের সঙ্গে শুধু ছালটা ছিল লাগানো। মাংস ও নাড়িভুঁড়ি প্রায় সবই খেয়ে ফেলেছিল বন্য শৃগাল-কুকুরে।

বনমানুষদের দলে তখন একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল।

তারা সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল বাঘটাকে আর তার হত্যাকারী সুচাঙকে।

সেইদিন সত্যি সত্যি সুচাঙের ওপর হ'লো তাদের ভক্তি। তারা নিঃসংশয়ে মেনে নিলে তাকে গুরু ব'লে, সর্দ্দার ব'লে। এতখানি ক্ষমতা যে তাদের মধ্যে আর কারো নেই একথা তারা সবাই তার সামনে স্বীকার ক'রে নিলে এবং সুচাঙকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতে লাগল ধেই ধেই ক'রে।

বাঘের চামড়াটা থেকে তখন হাড়মাংস পরিষ্কার ক'রে তারা সেই চামড়াটা সুচাঙের গায়ে জড়িয়ে দিলে। তার মানে এই যে, সুচাঙ্ তাদের কাছে বাঘের মত প্রবল পরাক্রমশালী, পশুদের রাজা বিশেষ।

সুচাঙের মুখে গর্ব্বের হাসি, জয়ের হাসি ফুটে উঠলো। যে বিরাট গাছের ওপরে সে সদা-সর্ব্বদা থাকতো, তারি একেবারে মগডালে রেখে দিলে সেই বাঘের চামড়াটা ও ছোরাটা।

সেইদিন থেকে সেই বিরাট গাছটাকে বনমানুষরা মনে করতো রাজপ্রাসাদ। সেখানে থাকে তাদের রাজা সুচাঙ্। তিন-চারটে গাছের মোটা মোটা কয়েকটা ডাল যেখানে একত্র হয়েছে তারি ওপর লতাপাতা বিছিয়ে সুচাঙ্ বসে থাকতো, কখনো শুয়ে থাকতো, কখনো বা অন্যান্য বনমানুষদের সঙ্গে খেলা করতো।

বনের মধ্যে সেই গাছটা ছিল সবচেয়ে উঁচু, তাই বেছে বেছে সুচাঙ্ বাসা বেঁধেছিল তার ওপর। অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যেতো তার মগডাল থেকে।

তরঙ্গায়িত পাহাড়ের মধ্যে কত বন, কত জঙ্গল, কত গহ্বর, কত বৃক্ষশির তা কে জানে! হিমালয়ের কোথা আদি কোথা অন্ত, তার বক্ষের মাঝে বাস ক'রে কিছুই নির্ণয় করা যায় না, মাথা যেন গুলিয়ে যায়। তাই মাঝে মাঝে সুচাঙ্ যখন গাছের মাথায় দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখতো চারিদিকে—সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে—সে হতাশ হয়ে পড়তো। যেদিকেই চায়, সেদিকেই সেই এক দৃশ্য—পাহাড়ের পর পাহাড়, অরণ্যের পর অরণ্য!

সুচাঙ্ এখন তরুণ যুবক।

তার ভয় নেই, ডর নেই। তার ওপর সে এখন বনমানুষদের সর্দ্দার। ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ায় যেখানে সেখানে। কোন কোন দিন সে ঘুরতে ঘুরতে এতদূরে হয়ত চলে যায় যে, রাত্রে ফিরতে পারে না তার বাসায়, তার দলের মধ্যে। কিন্তু তার জন্য আর মিয়াঙ্গী ভাবেও না, দলের অপর বনমানুষরা তাকে খোঁজাখুঁজিও করে না। তারা জানে সুচাঙ্ একেবারে অপরাজেয়। জঙ্গলের কোনো জানোয়ার তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। তাই তারা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে।

বার বার সে পরীক্ষা দিয়েছে তার সাহসের, তার বীর্য্যের এবং বার বার সে হয়েছে জয়ী। হয়তো কখনো তার জীবন বিপন্ন হয়েছে—হয়তো বা সে আঘাত পেয়েছে খুব, কিন্তু কোনদিন সে প্রাণে মরেনি। দুর্জ্জয় সাহস, অপরিমিত শক্তি ও অদ্ভুত বুদ্ধির বলে সে পশুদের হারিয়ে দিয়ে নিজে জয়লাভ করেছে।

সুচাঙ্ সর্ব্বদা সতর্ক থাকতো।

সে জানতো বনের মধ্যে চারিদিকে তার শত্রু। কখন কে কোন্ দিক দিয়ে কী অবস্থায় তাকে আক্রমণ করবে কে জানে? তাই নিজের দল, নিজের জাত ছাড়া আর কাউকে সে বিশ্বাস করতো না; আর কারুর ওপর তার আস্থা ছিল না। বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, গণ্ডার, গরিলা, বিষাক্ত বিষাক্ত সাপ, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কত জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে তাকে একই অরণ্যে, একই জায়গায় বাস করতে হ'ত দিনরাত।

অরণ্যের সন্তান তারা সকলেই। কেউ সবল, কেউ দুর্ব্বল; কেউ বৃহৎ, কেউ ক্ষুদ্র; কেউ হিংস্র, কেউ শান্ত। যখন যে যাকে সুবিধা পায় তার গলা টিপে মারে।

দুর্ব্বলের জন্য এ পৃথিবীতে স্থান নেই। এ পৃথিবী হ'লো বীরের, এ পৃথিবী হ'লো যোগ্যতম ব্যক্তির। তাই যুগযুগান্তর থেকে শুধু প্রবলেরা দুর্ব্বলের ওপর অত্যাচার ক'রে চলেছে; আর দুর্ব্বলেরা তাদের পায়ের তলায় পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। কোন উপায় নেই, কোন বিধি-ব্যবস্থা নেই। হিংসাই জীবের সহজাত ধর্ম্ম।

দিকে দিকে তাই এত হাহাকার, এত দুঃখ, এত শোক, এত হানাহানি কাটাকাটি। তাই বনে, জঙ্গলে, শহরে, গ্রামে সর্ব্বত্রই এই হিংসা, এই বর্ব্বরতা, এই নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী।

পশু হিংসা করে পশুকে, মানুষ হিংসা করে মানুষকে, এক জাত হিংসা করে অপর জাতকে, এক দেশ হিংসা করে অপর দেশকে। সবাই চায় প্রাধান্য, সবাই চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা। তাই ছলে বলে কৌশলে যেমন ক'রেই হোক্ হিংসার এই প্রবৃত্তি তারা চরিতার্থ করে।

সুচাঙকে বাস করতে হ'তো এই সব হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের মাঝে।

শুধু বন্ধু ছিল তার দলের বনমানুষরা, তার জাতের লোকেরা। আর একজনকে মাত্র সে পেয়েছিল বন্ধুরূপে সেই অরণ্যের মাঝে—তার নাম মেনাঙ্; জঙ্গলের বিরাট এক হাতী। সে তাকে পিঠে ক'রে ক'রে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো সারা জঙ্গলটা।

কিন্তু কেমন ক'রে তাদের দু'জনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব জন্মাল তা কেউ জানতো না। শুধু বন-মানুষেরা লক্ষ্য করেছিল, বহু চাঁদনী রাতে সুচাঙ্ আর মেনাঙ্ চলেছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে, গাছপালায় ঘেরা উঁচুনিচু পাহাড়ের পথ ধরে ধরে। যেখানে বন দুর্ভেদ্য, পথের কোন চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না, সেখানে সুচাঙ্ তার পিঠের ওপর উঠে বসতো এবং হাতীটা তাকে নিয়ে চলে যেতো বন থেকে বনান্তরে।

এইভাবে দিন কেটে যায়।

সমস্ত অরণ্যটা যেন সুচাঙের নখদর্পণে। সেখানকার প্রতি গাছপালা, প্রতি লতাপাতা, প্রতিটি প্রাণী তার পরিচিত; তারা কে কোথায় কখন কিভাবে থাকে, বাতাসের গন্ধে যেন সে বুঝতে পারে। সে তো মানুষের সন্তান। তাই বনের পশুদের সঙ্গে থেকে থেকে পশু হয়ে গেলেও যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে এলো তার দেহে পরিপূর্ণতা; এলো মস্তিষ্কের কোষে কোষে বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞান ও ভাবের জোয়ার। কেমন ক'রে সে তাকে রোধ করবে? তার পিতার রক্ত যে তার দেহের অস্থিতে, মজ্জাতে, শিরায়, উপশিরায়, মস্তিষ্কে প্রবাহিত হচ্ছে। সে যে রাজা ইন্দ্রনারায়ণের সন্তান; কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সে আজ জঙ্গলের পশু! তাই সে শুধু মানুষের মত সব কথা বুঝতে না পারলেও, মানুষের হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা-বেদনা অনুভব করতে পারতো; তারা যেন তার হৃদয়ের, তার অন্তরের দ্বারে এসে মূক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো।

পশুদের ভাষা ছিল তার ভাষা, সেই ভাষাতে বনমানুষদের সঙ্গে সে কথা বলতো। তারা তার আত্মীয়, তারা তার আপনজন। ছেলেবেলা থেকে সে শুধু শুনেছে তাদের কলরব, দেখেছে তাদের মুখ

তার চারিধারে। নিজেকে ছাড়া অন্য কোন মানুষকে সুচাঙ্ জীবনে কোনদিন দেখেনি। মানুষ কি, তাকে কেমন দেখতে, তাই তার কাছে ছিল এক রহস্যময় অজ্ঞাত বস্তু।

একদিন ভোরবেলা সুচাঙ্ চুপ ক'রে বসে আছে তার সেই উঁচু ডালে। এমন সময় তার নজরে পড়লো দূরে দুটো পাহাড়ের মধ্যে একটা সরু পথ ধরে পিলপিল ক'রে কতকগুলো জানোয়ার সেইদিকে আসছে। তাদের কাঁধে লম্বা লম্বা ধনুক, পিঠে কতকগুলি তীর ও ছোট ছোট অর্দ্ধ-গোলাকার ঢাল; কানে, নাকে সাদা সাদা হাতীর দাঁতের ও হাড়ের বিচিত্র গয়না; পরনে পশুপক্ষীর লোমশ চামড়া, মাথার চুলে নানারকমের পালক গোঁজা। তাদের বাকী সমস্ত দেহটা নগ্ন। কালো কয়লার মত তাদের রঙ আর ঠোঁটগুলো পুরু পুরু মোটা, সামনের দিকে ঝোলা। সে দেখে অবাক্ হয়ে গেল। তাদের দেহে লোম নেই, কিন্তু হাত পা চোখ মুখ নাক সবই তার মত।

সুচাঙ্ ভাবলে তবে কি তারা তারই মত জানোয়ার? কিন্তু তাদের রঙ তো তার মত নয়! তার মাথার মধ্যেটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। তাদের কাছে যেতে তার কেমন ভয় হ'লো। এতদিন এ জঙ্গলে আছে কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কখনো সে এরকমের জানোয়ার তো দেখেনি। তাই সে বসে বসে ভাবতে লাগল, এরা কে এবং কোথা থেকে এলো?

হায়! সে জানতো না যে, একদিন এমনি এক বুনো বেদের দল তাকে নিয়ে এসেছিল সেই বনে; তা না হ'লে হয়ত সেই 'মৃত্যুদ্বীপে' তার মায়ের সঙ্গে এতদিনে তারও মৃত্যু হতো।

যাই হোক, তাদের দেখে সুচাঙের মনে হ'লো এরাই তার নিজের জাতের লোক; তাই সেইদিন থেকে সে তাদের দেখাদেখি একটা বাঘের ছাল কৌপীন ক'রে পরতে শুরু করলে।

স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে সেই বিরাট বেদের দলটি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে, বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে আরো বহু দূরে একটা গভীর জঙ্গলে গিয়ে হাজির হ'লো। সেই জঙ্গলটা ছিল সুচাঙদের সীমানার বাইরে অনেক দূরে। সেখানে একটা জায়গায় তারা আবার বনজঙ্গল কেটে ঘর বাঁধল এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল।

শিকার ক'রে, গাছের ফলমূল খেয়ে তারা ঘুরে বেড়ায় বনে বনে। এই তাদের জীবন। কিন্তু এরা একটু উন্নত শ্রেণীর বেদে। এরা মাংস কাঁচা খায় না; আগুন জ্বালিয়ে তাতে পুড়িয়ে খায়। নিজেদের বাসস্থান নিজেরা বেড়া দিয়ে, কাঁটা গাছপালা দিয়ে ঘিরে রাখে, বন্য জন্তু-জানোয়ারদের সহজ আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। বন থেকে বিষাক্ত জিনিস সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসে অস্ত্র তৈরী করে, তীরধনুক তৈরী করে এবং তা দিয়ে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর প্রাণীদের হত্যা ক'রে নিজেদের জীবনরক্ষা করে।

একদিন হয়েছে কি, এদের দলের সর্দ্দারের ছেলে খি-ফা তীর, ধনুক, ঢাল প্রভৃতি সমস্ত রকমের শিকারের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে একাকী বেরিয়ে পড়লো শিকারের সন্ধানে।

সে যুবক। যেমন বলিষ্ঠ তার চেহারা তেমনি সাহসী। কিন্তু একটা হরিণকে লক্ষ্য ক'রে পেছনে পেছনে তাড়া করতে করতে সে এমন এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লো যে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার পথ আর কিছুতেই খুঁজে পেলে না। যেদিকে যায় সেই দিকেই ঘন অন্ধকার। কোন্

দিকে পথ—কোন্ দিক দিয়ে বেরুবে? হাতড়াতে হাতড়াতে সে চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল এবং ক্রমশঃ এমন একস্থানে এসে পড়লো যেখান থেকে আর সে কোন পথ দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লো।

সন্ধ্যা হবার যদিও তখন দেরি ছিল তবুও তার মনে হ'লো যেন সন্ধ্যা হয়ে গেছে; গাছে গাছে ঝোপঝাড়ে নেমেছে অন্ধকার।

এমন সময় একটা বাঘ গর্জ্জন ক'রে উঠলো তার ঠিক পেছনে, জঙ্গলের মধ্যে।

সামনেই ছিল কি একটা গাছ। কোন্ দিকে পথ দেখতে না পেয়ে খি-ফা বিদ্যুৎবেগে তার উপর উঠে পড়লো। তারপর ধনুকে তীর লাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে রইল সেইদিকে চেয়ে।

বাঘটা গর্জ্জন করতে করতে যেই ঝোপ থেকে মুখ বাড়িয়েছে অমনি সে মারলে একটা তীর। তার সেই অব্যর্থ লক্ষ্য গিয়ে বিঁধলো বাঘটার মাথায়—ঠিক চোখের ওপর। তীরের ফলকে মাখানো ছিল তীব্র বিষ। তাই মাত্র একটা শরে বিদ্ধ হয়েই বাঘটা লুটোপুটি খেতে লাগল মাটিতে এবং লেজের ঝাপটা মারতে মারতে গভীর গর্জ্জন করতে করতে দশ মিনিটের মধ্যে তার সমস্ত দেহটা স্থির ও কঠিন হয়ে গেল।

খি-ফা ভয়ে আর মাটিতে না নেমে সেই গাছটার মগডালে বসে রাত্তিরটা কাটিয়ে দিলে।

খি-ফা যে জঙ্গলটায় এসে পড়েছিল, সেটা সুচাঙদের বাসস্থান থেকে মাত্র সাড়ে তিন মাইল দূরে।

ভোর হ'তে না হ'তেই বনমানুষরা ছুটলো খাদ্যান্বেষণে। পূব আকাশ তখন সবে ঈষৎ লাল হয়েছে, কিন্তু অগণিত তারা রয়েছে আকাশে এবং অন্ধকারে ভাল ক'রে পথ দেখা যায় না। তারা সকলে যে যেদিকে পারলে চলে গেল। মেয়েরাই যায় আগে। কারণ তাদের শিশুসন্তানগুলিকে ও স্বামীদের সকাল হ'লেই খেতে দিতে হয়। ফলমূল যে যা পায় তাই সংগ্রহ ক'রে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। মিয়াঙ্গী গেল, অন্যান্য স্ত্রী-বনমানুষরাও গেল এবং দু-চারজন পুরুষও গেল।

দলবদ্ধ হয়ে তারা রওনা হ'লো বটে, কিন্তু খাদ্যান্বেষণ করতে করতে তারা কেউ এ গাছ কেউ ও গাছ, কেউ এ বন, কেউ ও বন ক'রে ছড়িয়ে পড়লো। কাছাকাছি থেকেও তারা যেন সকলে পৃথক। এইভাবে প্রত্যহ তারা কাজ করে। কিন্তু মিয়াঙ্গী কেমন ক'রে সেদিন একেবারে গিয়ে পড়লো খি-ফা যে গাছটায় বসেছিল তারি খুব কাছাকাছি একটা গাছে।

মিয়াঙ্গীকে দেখতে পেয়েই খি-ফার মনে কেমন ভয় হ'লো।

টপ্ ক'রে একটা বিষাক্ত তীর নিয়ে সে ধনুকে লাগাল এবং ডালপালার ফাঁক দিয়ে তাকে তাগ্ করতে লাগল।

মিয়াঙ্গী বেচারী ভালমানুষ; কখনো এ ডাল, কখনো ও ডাল ক'রে লাফিয়ে লাফিয়ে আপন মনে ফল পাড়ছিল। সে একদম জানতো না যে, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র নিয়ে।

সুচাঙ্ রোজই খুব ভোরে সকলের আগে ওঠে এবং চারিদিক একবার বেড়িয়ে দেখে আসে।

গাছের ডালে ডালে সে আনাগোনা করতো নিঃশব্দে। রাত্রিতে অন্ধকারে বনের মধ্যে কোথায় কি হ'লো এবং কেমন ক'রে হ'লো—তাই দেখবার ও জানবার জন্য তার ভারী কৌতূহল।

সে যেন সেই বনের রাজা। বনের প্রতিটি পশুপক্ষী প্রতিটি লতাপাতা তার অধীন। তারা সকলে মেনে চলবে তার শাসন এইরকম ছিল সুচাঙের মনের ধারণা। তাই সেদিন এইভাবে যখন সে ঘুরছিল হঠাৎ তার নজরে পড়লো একটা বিরাট সিংহী পা টিপে টিপে কোন একটা শিকারকে লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে চলেছে।

সিংহীটাকে দেখেই সে চিনতে পারলে—এটা সেই আগেকার সিংহী, যে একদিন তার এক জ্ঞাতিভাইকে হত্যা করেছিল পুকুরের ধারে। কিন্তু কেমন ক'রে সে আবার এত দূরে সেই বনেতে এলো কিছুই বুঝতে পারলে না!

তখনো ভাল ক'রে ভোর হয়নি—ফিঁকে অন্ধকারে সমস্ত অরণ্য অস্পষ্ট ও ঝাপসা। ডালের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সে দেখলে একটা বন্য মহিষ একটা ঝোপের মধ্যে শুয়ে আছে এবং তাকে লক্ষ্য ক'রেই সিংহীটা যাচ্ছে সেই দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে সে করলে কি, আরো কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে সেই দড়ির ফাঁসটা বনেতে পেতে চুপ ক'রে বসে রইল, গাছের ওপর একটা ডালে।

সিংহীটার তখন দৃষ্টি ছিল সেই মহিষটার ওপর, সে দড়িটাকে একেবারে দেখতেই পেলে না। তাই যেতে যেতে যেই সে দড়িটার ওপর একটা পা ও গলাটা বাড়িয়েছে অমনি সুচাঙ্ দড়িটা ধরে এমন এক টান মারলে যে, সঙ্গে সঙ্গে ফাঁস চেপে আটকে গেল সিংহীটার গলায়। তারপর সেও যত টানাটানি করে, ফাঁসটাও তত তার গলায় জোর ক'রে বসে যায়। এইভাবে দমবন্ধ হয়ে সে মরে গেল। সুচাঙ্ প্রতিহিংসা নিলে সিংহীটার ওপর।

ঠিক সেই সময় দূর থেকে একটা অস্পষ্ট চীৎকার ভেসে এলো তার কানে। সে যে বনমানুষদের চীৎকার, তার সঙ্গীদের চীৎকার, তা বুঝতে আর সুচাঙের কিছুমাত্র দেরি হ'লো না। সঙ্গে সঙ্গে সব ফেলে রেখে সে ছুটলো সেইদিকে।

কিন্তু সেখানে যেতেই সে দেখলে তার দলের অনেকগুলি জানোয়ার ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তার মা মিয়াঙ্গীকে। তার বুকে একটা তীর বেঁধা এবং রক্তে মাখামাখি অবস্থায় তার দেহটা মাটিতে পড়ে আছে—স্থির ও নিশ্চল।

মায়ের এই মৃতদেহ দেখে রাগে ও দুঃখে সুচাঙ্ ফুলতে লাগল এবং দু'হাত দিয়ে বুকটা চাপড়াতে চাপড়াতে সে চীৎকার ক'রে উঠল বারকতক। তারপর মায়ের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল ভেউ ভেউ ক'রে, ঠিক পাঁচ বছরের শিশুর মত। চোখের সামনে তার মর্ম্মভেদী হাহাকার ও শোকের এই করুণ দৃশ্য দেখে অন্যান্য বনমানুষরা পর্য্যন্ত চোখে জল রাখতে পারলে না; কেঁদে আকুল হ'লো। সে যে মিয়াঙ্গীকে কতখানি ভালবাসতো আজ বনমানুষরা সকলে তার প্রকৃত পরিচয় পেলে এবং সেই দিন থেকে সর্দ্দারের প্রতি তাদের মমতা আরো বেড়ে গেল।

হোক মিয়াঙ্গী বন্যপশু, জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ার, তাতে কি আসে যায়! সুচাঙ যে তাকে ছাড়া আর কাউকে মা ব'লে জানতো না; এ পৃথিবীতে আর কেউ যে তাকে ভালবাসেনি কোন দিন। সুচাঙের জীবনে সে-ই ছিল একমাত্র প্রাণী যে তাকে ভালবেসেছিল, তাকে আদর করেছিল, তার জন্য সহ্য করেছিল কত লাঞ্ছনা, কত অবমাননা। তাই মানুষের জীবনের যত কিছু শোক, যত কিছু দুঃখ সব যেন একসঙ্গে এক মুহূর্ত্তে সে অনুভব করতে লাগল মিয়াঙ্গীর এই মৃত্যুতে। স্নেহ, ভালবাসা ও মাতৃত্বের কাছে ছোট-বড় নেই, জাতিভেদ নেই, মানুষে কি পশুতে কোন তফাত নেই। সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে মা ও ছেলে এক, তাদের ভালবাসা এক।

কিছুক্ষণ শোক করবার পর সুচাঙ্ নিজেকে সামলে নিলে; তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দলের লোকদের জিজ্ঞাসা করলে, কে তার মাকে মারলে এবং কোথায় গেল সে?

তারা সকলে তখন আশেপাশে যে যার কাজে ব্যস্ত ছিল, কে যে সত্যি-সত্যি মিয়াঙ্গীকে মেরেছে তা কেউই দেখেনি। খি-ফা মিয়াঙ্গীকে তীর মারতেই সে যন্ত্রণায় দারুণ চীৎকার ক'রে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে গাছের ওপর থেকে একেবারে মাটিতে পড়ে যায়। তখন তার সেই চীৎকার শুনে বনমানুষরা সবাই ছুটে আসে তাকে রক্ষা করতে। কিন্তু এসে দেখলে ততক্ষণে মিয়াঙ্গী মরে গেছে।

আর এদিকে হয়েছে কি, মিয়াঙ্গীর সেই ভয়ঙ্কর চীৎকার শুনেই খি-ফা বুঝতে পারলে ব্যাপার সুবিধে নয়। এখুনি হয়তো বনমানুষের দল সেখানে এসে হাজির হবে। তাই আর এক মুহূর্ত্ত দেরি না ক'রে সে বনের মধ্যে দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলে। বনমানুষরা যেমন হিংস্র তেমনি দুর্দ্দান্ত এবং মানুষের শত্রু, একথা বেশ ভাল ক'রেই খি-ফা জানতো।

চীৎকার শুনেই গাছের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে, লাফাতে লাফাতে, দুলতে দুলতে বনমানুষরা যে যেখানে ছিল এসে হাজির হ'লো সেখানে; এবং কে মারলে মিয়াঙ্গীকে ঠিক বুঝতে না পেরে তারা তখনি এদিকে ওদিকে—চারিদিকে নিজেরা ছুটোছুটি করতে লাগল, তাকে ধরবার জন্য।

কিছুদূর যাবার পরই তারা সকলে একটা উঁচু গাছের ওপর থেকে দেখতে পেলে, একটা লোক তীরধনুক হাতে ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে এবং মাঝে-মাঝে চাইছে পিছন দিকে।

এই দৃশ্য দেখে বনমানুষরা অবাক হয়ে গেল। এ কি রকম অদ্ভুত জানোয়ার—কালো কুচকুচে রং, গায়ে কোন লোম নেই, কোন আবরণ নেই, একেবারে তেলা সাপের মত; কোমরে চামড়ার একটা কৌপীন, মাথায় কতকগুলো পালক গোঁজা, গলায় জীবজন্তুর হাড়! তারা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। মানুষ তারা ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখেনি একমাত্র সুচাঙকে ছাড়া। কিন্তু সুচাঙের সঙ্গে যে তার কোন সাদৃশ্য আছে, ওকথা একবারও তাদের মাথায় গেল না।

তাই কিছুদূর তার পেছনে পেছনে ছুটে গিয়ে তাদের প্রাণে কেমন ভয় হ'লো; তারা এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল। আর ততক্ষণে খি-ফা তাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

সুচাঙ্ যখন তাদের জিজ্ঞাসা করলে কে মেরেছে তার মাকে এবং কোন্ দিকে সে গেছে, তারা তখন সেই অদ্ভুত জানোয়ারের সম্বন্ধে যা-যা জানতো সবিস্তারে তাকে বললে কিচিরমিচির ক'রে, পশুদের বিচিত্র ভাষায় ; এবং তাকে দেখিয়ে দিলে সেই দিকটা।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সুচাঙের চোখ দু'টো আগুনের মত জ্বলে উঠলো এবং বুকটা আরও চওড়া হয়ে গেল ; সে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে ছোরাটাকে কঠিন ভাবে হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে ছুটলো বনের মধ্যে—যেদিকে সূর্য্য ওঠে সেইদিকে। গাছের ডালগুলো দুলে দুলে উঠলো, সমস্ত বনভূমি কেঁপে উঠলো তার সেই দ্রুত গতিতে।

ঘুরে না গিয়ে সে একেবারে সোজা পথ ধরলে—বনজঙ্গল ভেদ ক'রে, লতাপাতা ছিঁড়ে ভেঙ্গে চুরমার করতে করতে। মাতৃহত্যার প্রতিশোধ এখনি নিতে হবে, যেমন ক'রে হোক—এই তার প্রতিজ্ঞা।

এক ঘণ্টা, দু ঘুন্টা, তিন ঘণ্টা কেটে গেল। তবুও সুচাঙ্ কোন হদিস পেলে না তার শত্রুর। যে রকম বর্ণনা সে তার শুনেছিল সে রকমের কোন জানোয়ার পড়লো না তার নজরে। একবার তার মনে হ'লো বোধ হয় সে ভুলপথে এসেছে, তাই কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে বসে ভেবে নিলে পূব দিক কোন্টা এবং কোন্ দিক থেকে সূর্য্য উঠেছে। তারপর বুঝতে পারলে পথ ভুল হয়নি, ঠিক পথেই এসেছে সে। তখন আবার সেই পথ ধরেই ক্রমাগত এগিয়ে যেতে লাগল।

সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে আরো মাইলখানেক গিয়ে হঠাৎ সুচাঙ্ চম্কে উঠলো। দেখলে ঠিক তার নিজের মত হাত-পা-ওয়ালা একটা কালো জানোয়ার দাঁড়িয়ে আছে দূরে উঁচু একটা পাহাড়ের উপর এবং ধনুকে তীর লাগিয়ে সে লক্ষ্য করছে একটা বুনো শূয়ারকে। যেমনি ধনুকটা বেঁকিয়ে তীরটাকে বুক পর্য্যন্ত টেনে এনে সে ছেড়ে দিলে অমনি চীৎকার করতে করতে শূয়ারটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তার বুকে যেখানে তীরটা বিঁধলো সেখান থেকে রক্ত পড়তে লাগল ঝর ঝর ক'রে। তখনি ছুটে এসে সে তার কোমর থেকে ছোরার মত একটা কি অস্ত্র বার ক'রে শূয়ারটার বুক চিরে ফেললে এবং কয়েক টুকরো মাংস কেটে নিয়ে সেইখানে কাঠ-লতাপাতা যোগাড় ক'রে দুটো পাথর ঠুকে আগুন জ্বালালে ; তারপর মাংসটা তাতে পুড়িয়ে খেয়ে ফেললে।

আগুন জ্বালাতে এর আগে সুচাঙ্ কখনো কাউকে দেখেনি। সে দেখেছিল বিদ্যুতের শিখা আকাশের কালো বুকে জ্বলে উঠতে, সে দেখেছিল বজ্রপাতে গাছের মাথা পুড়ে যেতে, সে দেখেছিল দাবানলের তীব্র অগ্নিলীলা বনভূমিকে পুড়িয়ে দিতে। কিন্তু কোন জানোয়ার যে আগুন জ্বালতে পারে তা সুচাঙ্ ইতিপূর্ব্বে কোনদিন ভাবতেও পারেনি। তাই সে অবাক হয়ে গেল তাকে চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাতে দেখে। কে সে? কোথায় থাকে এবং কেমন তার জীবন-যাত্রা প্রণালী, এই সব জানবার জন্য সুচাঙের মনে তখন ভারী কৌতূহল হ'লো। সেই ধনুকধারী যে তার মাতৃহন্তা সে বিষয়ে আর তার কোন সন্দেহই রইল না। কিন্তু তবুও সেইখানে তখনি তাকে হত্যা করবার চেষ্টা না ক'রে সে তার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল। হত্যা সে তাকে করবেই, কিন্তু পরে করলেই চলবে, এই ভেবে সে তার পিছু পিছু চুপি চুপি যেতে লাগল।

খি-ফার ভারী খিদে পেয়েছিল। আগের দিন রাত্তির থেকে তার পেটে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত যায়নি। পথ হারিয়ে সেই দুর্গম স্থানে রাত্রিযাপনে তার মনে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হয়েছিল যথেষ্ট। তার ওপর আবার ভোর থেকে এই প্রাণভয়ে ছুটোছুটি। তাই সেই স্থানটিকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে ক'রে বেচারী শূয়ারটাকে শিকার করলে এবং পেট পুরে মাংস খেয়ে আবার তার বাসার দিকে রওনা হ'লো। এবার সে তার চেনা-পথে এসে পড়েছিল, কাজেই তার আর কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। তখনো সে মোটেই জানতো না যে, সাক্ষাৎ যম তার পিছু নিয়েছে।

খিদে সুচাঙেরও পেয়েছিল খুব। তাই খি-ফা যেই সেস্থান পরিত্যাগ ক'রে চলে গেল, সুচাঙ্ অমনি গাছ থেকে নেমে পড়ে ছুরি দিয়ে সেই শূয়ারের দেহ থেকে খানিকটা মাংস তেমনি ক'রে কেটে নিলে এবং তার দেখাদেখি আগুনে পুড়িয়ে খেতে লাগল। এই প্রথম সে আগুনে পোড়ানো মাংস খেলে এবং খেতে তার খুব ভালই লাগল। তারপর সেও যত এগোয়, সুচাঙ্ও যায় তত তার পিছু পিছু।

একটা জিনিস দেখে সুচাঙ্ যেমন আশ্চর্য হ'লো তেমনি ভয়ও পেলে খুব। পথে যেতে যেতে একটা ভীষণ অজগর সাপ খি-ফাকে তেড়ে এলো, কিন্তু ছোট্ট একটি তীর যেই সে মারলে তার গায়ে অমনি সাপটা মরে কাঠ হয়ে পড়ে গেল।

আবার কিছুদূর যাবার পর যেই সে একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছে, অমনি একটা গরিলা কোথায় লুকিয়েছিল তাকে দেখেই তেড়ে এলো ভীষণ গর্জন করতে করতে। খি-ফা প্রাণভয়ে ছুটতে লাগল তাকে দেখে; কিন্তু সেও যত ছোটে গরিলাটাও তত ছোটে; তখন হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে খি-ফা একটা তীর ছুঁড়লে। কিন্তু সেই তীরটা তার গায়ে না লেগে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর গরিলাটা যখন দ্বিগুণ গর্জন করতে করতে হাঁ ক'রে একেবারে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বার জন্য পা তুলেছে, অমনি সে আবার একটা তীর ছুঁড়লে তাকে লক্ষ্য ক'রে। এবার খি-ফার অব্যর্থ শরসন্ধান একেবারে তার বুকে গিয়ে বিঁধলো। চীৎকার ক'রে সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো এবং ছট্‌ফট করতে করতে তৎক্ষণাৎ মরে গেল।

সুচাঙ্ অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল—যে ভীষণ গরিলাকে সে কতক্ষণ ধরে কত ধস্তাধস্তি ক'রে, কত আঘাত খেয়ে, ক্ষতবিক্ষত দেহে তবে হত্যা করেছিল তাকে এক নিমেষে শুধু ঐ সামান্য তীরের আঘাতে কেমন ক'রে সে মেরে ফেললে! নিশ্চয় ওই তীরের মধ্যে এমন কিছু একটা জিনিস আছে যা দেহে বিঁধলেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়। তাই সেই তীরগুলোকে কেমন ক'রে সে তার কাছ থেকে কেড়ে নেবে এই চিন্তা করতে লাগল। এদিকে খি-পার সামনে যেতেও তার ভয় করতে লাগল ভীষণ। যদি দূর থেকে হঠাৎ তার গায়ে তীর ছুঁড়ে মারে তা হ'লেই তো মৃত্যু। তা হ'লে তো আর তার মার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। চুপি চুপি গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সুচাঙ্ এই সব ভাবতে লাগল।

হঠাৎ নীচের দিকে চোখ পড়তেই সে অবাক হয়ে গেল। একটা জায়গায় ছোট ছোট

লতাপাতা দিয়ে ঘেরা অনেকগুলি ঘর এবং সেখানে খি-ফার মত অনেকগুলি জানোয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে। খি-ফা গিয়ে সেই দলের মধ্যে ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকে এসে তাকে ঘিরে ধরলে এবং কি সব জিজ্ঞেস করতে লাগল। তাদের কথা সে কিছুই শুনতে পেলে না এত দূর গাছের ওপর থেকে। শুধু সে চুপ ক'রে বসে চিনে নিতে লাগল সেই স্থানটি। সেখানে সুচাঙ্ এর আগে কোনদিন আসেনি। সে স্থানটি সম্পূর্ণ তার অপরিচিত।

মধ্যাহ্নের সূর্য তখন মাথার ওপর থেকে অগ্নিবৃষ্টি করছে। গাছপালা ও লতাপাতার মধ্যে দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়—উজ্জ্বল ও স্পষ্ট। সুচাঙ্ ঘুরেফিরে চারিদিক দেখতে লাগল। সেই জায়গাটি অতি নির্জন ও অতি গোপন স্থানে—পাহাড়ের যেন অন্তরের মধ্যে। চারিদিক গাছপালা দিয়ে ঘেরা ঘন বেড়া স্থানটিকে সুরক্ষিত ক'রে রেখেছে, বহু লোকজন তার মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই ব্যস্ত নিজ নিজ কাজে।

সুচাঙের তখন মনে পড়লো, একদিন সে দেখেছিল দূর দিয়ে একটা দলকে পাহাড়ের ভিতর ঢুকতে—এরা বোধ হয় তারাই। তাদের বেশভূষা ছিল এদের মত এবং তাদের দেখতেও ছিল অনেকটা এই রকম। তাছাড়া তাদের দলেও ছিল এই রকমের ছোট বড় অনেক লোক ; এই রকমের বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ।

এই সব অদ্ভুত জানোয়ারদের কথা ভাবতে ভাবতে সে বাসায় ফিরে গেল এবং সে যাবার সময় পথঘাট সব ভাল ক'রে চিনে গেল। সব চেয়ে যে কথাটা তার মনে পড়ছিল সদাসর্বদা তা হ'লো খি-ফার সেই আশ্চর্য তীরধনুক। কি অসীম ক্ষমতা তার! যার গায়ে একবার লাগে সে-ই মরে যায়—যত বড়, যত ভীষণ জানোয়ার হোক না কেন সে।

সুচাঙ্ বাসায় ফিরে গেল বটে, কিন্তু সেদিন রাত্রে সে ভাল ক'রে ঘুমোতেই পারলে না। সকল সময় সেই ধনুকধারীর কথা তার মনে পড়তে লাগল।

পরদিন খুব ভোরে উঠেই দড়িটা ও ছোরাটা কোমরে গুঁজে আবার সে গেল সেই বনে—সেই অদ্ভুত লোকগুলোর রীতিনীতি লক্ষ্য করবার জন্য। দূরে একটা উঁচু গাছের ডালের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সে দেখতে লাগল তারা কি করে!

ভোর থেকেই তারা ব্যস্ত। কেউ কাঠ আনছে, কেউ আগুন জ্বালছে, কেউ ফলমূল খেতে দিচ্ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের, কেউ বিষাক্ত গাছের শেকড় ও সাপের তীব্র বিষ একত্র বেটে তীরের ফলকে লাগাচ্ছে, কেউবা সেগুলোকে যত্ন ক'রে শুকোতে দিচ্ছে। কেউ ধনুকে ছিলে পরাচ্ছে, কেউ অস্ত্রশস্ত্রগুলো বার ক'রে পাথরে শাণ দিচ্ছে।

এক জায়গায় আবার অনেকগুলো স্ত্রী-পুরুষ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গাইছে ও নাচছে। অদ্ভুত তাদের নৃত্যভঙ্গি, অদ্ভুত তাদের সঙ্গীত। তাদের মাঝখানে আস্ত একটা কি জানোয়ার ঝুলছে এবং নীচে থেকে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে। তারা নাচছে আর মাঝে মাঝে সেই আগুনে ঝলসানো মাংস ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খাচ্ছে।

সুচাঙ্ তাদের এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল এবং কোন সাড়াশব্দ না দিয়ে চুপচাপ সেখানে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে নাচগান থেমে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে মাংস খাওয়াও শেষ হ'লো।

তারপর তীরধনুক নিয়ে সাত-আটজন পুরুষ বেরিয়ে এলো এবং তাদের সর্দার যাকে যে দিকে শিকার করতে যেতে বললে তারা সে দিকে চলে গেল।

খি-ফাকে দেখেই সুচাঙ্ চিনতে পারলে। সে তীরধনুক নিয়ে সেই বনটার মধ্যে ঢুকলো শিকার করবার জন্য। সুচাঙ্ও তার পেছনে পেছনে ছায়ার মত চুপিচুপি যেতে লাগল। শিকার খুঁজতে খুঁজতে খি-ফা গিয়ে পড়লো এক গভীর অরণ্যে। সেখানকার প্রতি গাছপালা, প্রতি ঝোপঝাড় তার পরিচিত। রোজই সে ঘুরেফিরে বেড়ায় তার মধ্যে। তাই অনেকক্ষণ ধরে খি-ফা এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি ক'রে শেষে শিকার করলে একটা হরিণ। তারপর সেই মৃত হরিণটাকে কাঁধে চাপিয়ে সে চললো বাসার দিকে।

তখন বেশ বেলা হয়েছে। রোদে পাহাড়গুলো তেতে আগুন হয়ে উঠেছে। তার ওপর খি-ফার কাঁধে রয়েছে একটা বিরাট বোঝা। কিছুক্ষণ চলার পর সে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লো এবং নিকটে একটা জলাশয় দেখে তার কাছে গেল। খি-ফা হরিণটাকে ডাঙ্গায় নামিয়ে রেখে আঁজলা-ভরে খুব খানিকটা জলপান করলে। তারপর তার কি মনে হ'লো, একটা গাছের ডালে তীরধনুক টাঙিয়ে রেখে একেবারে জলে নেমে স্নান করতে লাগল ডুব দিয়ে।

সুচাঙ্ যেন এতক্ষণ এই অবসরই খুঁজছিল। সে কালবিলম্ব না ক'রে চুপিচুপি সেই তীর-ধনুকটা নিয়ে পালিয়ে গেল।

স্নান ক'রে উঠে খি-ফা অবাক হয়ে গেল। কে নিলে, কোথায় গেল তীরধনুক! এই ভেবে আশেপাশে অনুসন্ধান করতে লাগল, কিন্তু কোথাও খুঁজে না পেয়ে তার মনে ভয় হ'লো। সে আর এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে ততক্ষণাৎ হরিণটাকে কাঁধে ফেলে চলতে শুরু করলে।

ইত্যবসরে সুচাঙ্ সেইগুলো একটা খুব উঁচু গাছের ওপরে লুকিয়ে রাখলে এবং পাছে তারা হারিয়ে যায় বা গাছটাকে চিনতে না পারে এই ভয়ে ছোরাটা বার ক'রে সে সেই গাছের কতকগুলো ডাল কেটে ভাল ক'রে চিহ্ন ক'রে রাখলে। তারপর আবার খি-ফার অনুসরণ করলে। সে তার মাতৃহন্তা। তার ওপর সুচাঙের ভারী রাগ। যেমন ক'রে হোক মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। এই মনে ক'রে সুচাঙ্ খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে সেই দড়িটার ফাঁস পাতলে এবং চুপচাপ একটা গাছের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে খি-ফা এলো সেই পথ দিয়ে। তার কাঁধে ছিল ভীষণ ভার, তাই তার সামনে কি আছে দেখতে না পেয়ে সে একেবারে সেই ফাঁসটার মধ্যে গলা বাড়িয়ে দিলে। যেমন দেওয়া আর অমনি সুচাঙ্ দড়িটা ধরে দিলে এক টান। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসটা এঁটে গেল খি-ফার গলায়। তখন সে যতই ফাঁসটা ছাড়াবার জন্য ছট্ফট করতে লাগল ততই তার গলায় দড়িটা চেপে বসে যেতে লাগল।

শেষে দমবন্ধ হয়ে সে মরে গেল। সুচাঙের ইচ্ছা পূর্ণ হ'লো। মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিলে ছোরাটা বার ক'রে তার বুকে বসিয়ে দিয়ে। তারপর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সে তার শত্রুর দেহটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করতে লাগল। হাত দিয়ে খি-ফার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সে নেড়েচেড়ে দেখলে এবং দু-একটা হাড়ের অলঙ্কার তার গলা থেকে খুলে নিয়ে নিজের গলায় পরলে। এত কাছে থেকে সে খি-ফাকে দেখবার সুযোগ এর আগে কখনো পায়নি। তাই তার নিজের দেহের সঙ্গে তার দেহটা একটু একটু ক'রে মিলিয়ে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। শুধু রঙটা তার কুচকুচে কালো, তাছাড়া প্রায় সবই তার মতন। নিজের মাদুলিটা তখন সুচাঙ্ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল, সেই হাড়ের মালার চেয়ে ভাল দেখায় কিনা। তারপর যে গাছটার ওপর তীরধনুক রেখেছিল তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে তীর-ধনুক পেড়ে আনলে এবং ধনুকে তীর পরিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল সে ছুঁড়তে পারে কিনা।

নির্জন বন। কেউ কোথাও নেই। তারি মধ্যে বসে বসে সুচাঙ্ তীর ছুঁড়তে লাগল একটা গাছকে লক্ষ্য ক'রে। কিন্তু হায়! যে তীরটা সে ছোঁড়ে সেটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কোনটাই আর সেই গাছে লাগে না। তখন তার ভারী জেদ চেপে গেল। সে একটার পর একটা তীর নিয়ে সেই গাছকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়তে লাগল এবং যতবার ছোঁড়ে ততবার হয় অকৃতকার্য। যেমন ক'রে হোক্ লাগাবই গাছটাকে এই ছিল তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবার অনেক আগেই গেল তার সব তীর ফুরিয়ে।

তখন সুচাঙ্ ভারী চটে গেল। এখন তীর কোথায় পাই? এই কথা সে চিন্তা করছে এমন সময় তার মনে পড়ে গেল অনেক তীর সে দেখেছে সেই জঙ্গলী জানোয়ারদের কুটীরে। তাদের সকলেরই তীরধনুক আছে। কিন্তু কেমন ক'রে সেগুলি নিয়ে আসবে তাদের বাসা থেকে এই কথা সে ভাবতে লাগল। এমন সময় একটা বিকট রব উঠলো; সুচাঙ্ চমকে উঠে তাড়াতাড়ি একটা উঁচু গাছের মধ্যে গিয়ে লুকালো। তারপর কিসের শব্দ জানবার জন্য সে চুপি চুপি এগিয়ে যেতে লাগল সেইদিকে, কিন্তু কিছুদূর যাবার পর সে যা দেখলে তাতে তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল।

খি-ফার মৃতদেহের নীচে দাঁড়িয়ে তাদেরই দলের আর একজন লোক সেই রকম বিকট চিৎকার করছে। আর সেই চীৎকার শুনে তাদের দলের যে যেখানে ছিল—ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ প্রত্যেকে নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের কুঁড়ে ছেড়ে ছুটতে ছুটতে আসছে সেই দিকে।

সুচাঙ্ দেখলে এই সুযোগ। সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, এই অবসরে যদি তাদের ঘরে গিয়ে খোঁজ করি তো কিছু তীর নিশ্চয়ই সংগ্রহ হবে। তাই কালবিলম্ব না ক'রে সেও চুপিচুপি বনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ঢুকে পড়লো তাদের কুঁড়ের মধ্যে। কিন্তু বিপদ হ'লো এই যে, সেখানে গিয়ে সে কোথাও আর তীর দেখতে পায় না। সবাই তীরধনুক নিয়ে চলে গেছে। তাই এঘর ওঘর ক'রে অনেক ঘর খুঁজে খুঁজে শেষে সে একেবারে তাদের সর্দারের ঘরে গিয়ে ঢুকলো এবং দেখলে অনেকগুলো তীর তার দেওয়ালে সাজানো রয়েছে। সে তাড়াতাড়ি যতগুলো পারলে এখান ওখান থেকে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে এবং আর কোথাও না থেমে একেবারে সোজা চলে গেল নিজের বাসায়।

এদিকে তারা সকলে খি-ফার মৃতদেহটাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে গেল তাদের কুটীরের মধ্যে এবং সকলে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাকে উঠানের মাঝে একটা জায়গায় গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেললে। খি-ফা সর্দারের ছেলে, তাই এই ব্যবস্থা হ'লো তার। অন্য কেউ হলে বনের মধ্যেই তাকে ফেলে রেখে দিয়ে আসতো।

সর্দার ঘরের মধ্যে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। দেখলে সমস্ত জিনিসপত্তর চারিদিকে ছড়ানো এবং বিষমাখানো ভাল তীরগুলো কে নিয়ে গেছে।

সর্দারের ঘরে কারুর ঢোকবার হুকুম নেই। সে তখনি সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, কে ঢুকেছিল? তারা সকলে একবাক্যে বললে, জানি না। তখন সর্দার রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। কে যেন তার মনে বলতে লাগল, নিশ্চয় এ কাজ তার যে হত্যা করছে তার একমাত্র পুত্র খি-ফাকে।

কিন্তু কে সে? মানুষ—না তার চেয়ে ভীষণতর কোন উপদেবতা? এই চিন্তা করতে করতে গেল তার মুখ শুকিয়ে। তার মন বললে, মানুষ কখনই হ'তে পারে না। কেননা মানুষ হ'লে তাদের সকলের চোখের সামনে দিয়ে কেমন ক'রে সে এই অঘটন ঘটালো? কোন্ দিক দিয়ে সে এলো আর কোন্দিক দিয়ে চলে গেল? তাদের সবার চোখে ধুলো দিয়ে কোন মানুষ এই বনে থাকতে পারে না। অসম্ভব। তাই সর্দারের মনে হ'লো হয়ত এ কোন দৈত্যদানব হবে।

ওদিকে হ'লো কি, সুচাঙ্ তীরধনুক নিয়ে অনবরত অভ্যাস করতে করতে অল্পদিনের মধ্যেই বেশ সুদক্ষ তীরন্দাজ হয়ে উঠলো। একদিন একটা হরিণ ছুটে যাচ্ছিল, সে তাকে লক্ষ্য ক'রে তীর ছুঁড়লে আর সঙ্গে সঙ্গে হরিণটা পড়ে মরে গেল। আর একদিন একটা বিরাট অজগর সাপ একটা গাছের ডাল থেকে আর একটা গাছের ডালে যাচ্ছিল এমন সময় সুচাঙ্ মারলে তীর। তীরটা গিয়ে একেবারে বিঁধলো তার মাথায়। সাপটা ছট্ফট করতে করতে মাটিতে পড়ে মরে গেল। সুচাঙের তাই দেখে কি আনন্দ! নতুন বিদ্যে শিখেছে, এখন কিছু দেখলেই তার হাত সুড়সুড় করে। ছোট ছোট পোকামাকড় যা তার চোখে পড়ে তখুনি সে তীর দিয়ে তাকে বিঁধে ফেলে এবং নিজের এই তাগ্ দেখে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়।

এইভাবে আবার একদিন তার সব তীর ফুরিয়ে গেল। তখন সে আবার চুপিচুপি সেই বনের দিকে রওনা হ'লো। কাছাকাছি গিয়েই সুচাঙ্ চুপ ক'রে একটা গাছের মাথায় লুকিয়ে রইল। ভয়ে তার বুক কাঁপতে লাগল। চারদিকে তখন তীরধনুক নিয়ে লোকজন ছুটোছুটি করছে। কোথায় যে তারা যাচ্ছে এবং কেন যে এমন করছে তা সে বুঝতেই পারলে না। কিন্তু তাদের তীরগুলো যে কী ভীষণ তা সে জানতো খুব ভাল করেই। তাই কোন্ দিক দিয়ে তাদের ঘরে ঢোকা যায় এবং কেমন ক'রে আবার তীর সংগ্রহ ক'রে ফিরে আসা যায় তাই বসে বসে ভাবতে লাগল।

সূর্য অস্ত গেল। মেয়েরা লেগে গেল বিকালের কাজে। বাইরে রোদে কতকগুলো তীর শুকোচ্ছিল। মেয়েরা এসে সেগুলো নিয়ে যে যার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। ছেলেমেয়েরা সেখানে ছুটোছুটি ক'রে খেলা করছিল, তারা কতগুলো ফল এনে খেতে দিলে তাদের। কতকগুলো ষণ্ডা ষণ্ডা পুরুষ ও মেয়ে কাঁধে ক'রে কাঠ নিয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের এক কোণে জড়ো করতে লাগল।

অপরাহ্নের মৃদু আলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল অরণ্যের অস্পষ্টতায়।

এমন সময় আবার একটা সেই রকমের বিকট রব উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে থেকে সবাই পিল পিল ক'রে বেরিয়ে এলো বাইরে এবং যে যেখানে ছিল ছুটলো ফটকের দিকে।

সুচাঙ্ দেখলে একটা বড় ফটক খুলে গেল এবং তার ভিতর দিয়ে কতকগুলো লোক টানতে টানতে একটা বিরাট জন্তুকে নিয়ে এলো উঠানে। কাঠ দিয়ে উঁচু ক'রে একটা মাচার মত বাঁধা ছিল। তার ওপর জন্তুটাকে তারা বেশ করে বাঁধলে এবং নীচে যে স্তূপাকার কাঠ ছিল তাতে আগুন লাগিয়ে দিলে, তারপর তাকে ঘিরে সবাই গান ধরলে এবং নাচতে লাগল।

এই সুযোগ! সুচাঙ্ চুপিচুপি এসে আবার তাদের ঘরে ঢুকলো। কিন্তু ঘরের মধ্যে তখন অন্ধকার, ভাল ক'রে কিছুই দেখা যায় না। সে হাতড়াতে হাতড়াতে কতকগুলো তীর এঘর ওঘর থেকে যোগাড় করতে লাগল। শেষে যেমন আর একটা ঘরে ঢুকেছে অমনি তার মনে হ'লো কে যেন ছুটতে ছুটতে একেবারে সেই ঘরের দরজার সামনে এসে পড়েছে। পাছে তাকে দেখতে পায় এই ভয়ে সুচাঙ্ তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লো সেই ঘরের এক অন্ধকার কোণে।

একটা মেয়ে তখনি ছুটে এসে ঢুকে পড়লো সেই ঘরে। সে একটা অস্ত্র নিতে এসেছিল মাংস কাটবে ব'লে। যে কোণে সুচাঙ্ লুকিয়েছিল সেখানেই ছিল তার অস্ত্রটা। কাজেই সে অন্ধকারে সেই অস্ত্রটা ধরার জন্য যতই হাত বাড়াতে লাগল ততই সুচাঙ্ সরে যেতে লাগল পিছনে। মেয়েটা একদম তাকে দেখতে পায়নি। তাই সে হাত বাড়িয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে যেতেই হঠাৎ সুচাঙের গায়ে তার হাতটা ঠেকে গেল। সে চমকে উঠে দেখলে সামনে একটা অদ্ভুত রকমের জানোয়ার। সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে তাকে দেখাচ্ছিল বীভৎস। বিশ্রী রকমের একটা উৎকট আওয়াজ মুখে করতে করতে তখনই মেয়েটা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে সেই জনতার মাঝখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাদের বললে, কে একজন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, যেমন বিরাট তার চেহারা তেমনি অদ্ভুত তাকে দেখতে!

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং সকলে ছুটলো সেই ঘরের দিকে তাকে ধরবার জন্য। কিন্তু হায়, তারা গিয়ে দেখলে সে পালিয়েছে, কেউ কোথায়ও নেই, সব ফাঁকা! আগুন জ্বালিয়ে তখন তারা ঘরে ঘরে দেখলে, কিন্তু বৃথা।

আবার তারা সকলে ফিরে গিয়ে আনন্দ-উৎসবে মত্ত হ'লো। তখনো অন্ধকার হয়নি, দিনের ক্ষীণ আলো রয়েছে। সেই মাংসপিণ্ডটাকে ঘিরে তারা নাচগান শুরু করলে। সর্দারের কিন্তু ভাবান্তর উপস্থিত হ'লো। নাচগান তার আর ভাল লাগল না—ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে সে ভাবতে লাগল কে সে? কেন সে বার বার আসছে এখানে?

সুচাঙের মাথায় তখন এক শয়তানি মতলব গেল। সে একটা গাছের ডালের ওপর উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে একটা তীর ছুঁড়লে। তীরটা গিয়ে একজনের বুকে লাগল এবং সে তৎক্ষণাৎ চীৎকার করতে করতে সেখানে পড়ে মরে গেল। গাছের ওপর দিকে চাইতেই তারা সকলে দেখতে

পেলে স্থচাঙ্‌কে।

স্থন্দর মানুষের মত দেহ অথচ উলঙ্গ, বাঘের চামড়া দিয়ে শুধু একটু কৌপীন-আঁটা। স্থচাঙ্‌ গাছে গাছে বনমানুষের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ঢুলে ঢুলে চলে গেল। কে সে—কেনই বা এমন করছে তারা বুঝতে পারলে না। এসব তাদের চিন্তার বাইরে, তাদের মাথা যেন গুলিয়ে গেল। অনেক গবেষণা ক'রে তারা স্থির করলে, ও আর কিছু নয়—বনের দেবতা। অন্য কোন কারণে হয়ত তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছে, তাই এসব মৃত্যু ঘটছে।

এইভাবে স্থচাঙ্‌কে তারা মনে করলে বনের দেবতা এবং তাকে খুশী করবার জন্য সেইদিন থেকে তারা প্রত্যহ খানিকটা ক'রে মাংস ও রক্ত সেই গাছটার গোড়ায় দিয়ে আসতো।

স্থচাঙ্‌ নির্ভয়ে বনের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। তার হাতে আছে এখন ব্রহ্মাস্ত্র—কাউকে সে ভয় করে না। গাছের মগডালে অতি গোপন স্থানে সে লুকিয়ে রাখে তার সেই তীর ও ধনুক। সে এখন বেপরোয়া। বাঘ, ভালুক, সিংহ, অজগর, গরিলা, বন্য হস্তী কাউকে আর তার ভয় নেই। একে তার দেহে মত্ত হস্তীর বল, তায় আবার এই বিষাক্ত তীরধনুকের সে মালিক।

এইভাবে স্থচাঙ্‌ সেই বনের মধ্যে সব জন্তু-জানোয়ারদের রাজা ও অসভ্য জংলীগুলোর দেবতা হয়ে বাস করতে লাগল। এই অরণ্য হ'লো তার রাজত্ব। এ ছাড়াও যে বাইরে কোনো জগৎ আছে তা সে ভাবতে পারতো না, কল্পনা করতে পারতো না। মানুষের জগৎ, সভ্যতার জগৎ, জ্ঞানের জগৎ, তার কাছে তখন ছিল চিরমৌন, চিরঅজ্ঞাত।

হায়, একটা মানুষ হয়ে গেল বন্য জন্তু—শুধু সঙ্গদোষে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার দোষে! অরণ্যের রহস্য, অরণ্যের ভাষা, অরণ্যের পশুপক্ষী, অরণ্যের বৃক্ষলতা ঘিরে রইল এক স্থন্দর মানব-শিশুকে, তার জীবনের স্থদীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর ধ'রে।

ভগবানের শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি এই মানুষ। প্রকৃতির স্থন্দরতম দান এই মানুষ। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, কল্পনা—নিত্য নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে চির প্রবহমান। তাই মানুষের ইতিহাস নিত্য নব নব রূপ ধরে। তাই তারা নিত্য নূতন। আর পশুপক্ষী জন্তু-জানোয়ারদের ইতিহাস একই ভাবে একই রূপে সেই স্থষ্টির প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। তাই তো একই স্থষ্টির মধ্যে মানুষ স্বতন্ত্র। পশুপক্ষী জন্তু-জানোয়ার যেখানে থাকে, মানুষ সেখানে থাকতে পারে না। তারা যে পথে চলে, মানুষ সে পথে চলে না। তাই বনের মধ্যে যখন স্থচাঙ্‌ তার রাজত্ব নিয়ে ব্যস্ত তখন বাইরের জগতে, জ্ঞানের জগতে এমন একটা ঘটনা ঘটলো যা থেকে স্থচাঙের জীবনের গতি গেল বদলে।

মানুষের মনে ভারী কৌতূহল। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, নিত্য নূতন জ্ঞানের কত পিপাসা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় প্রতিদিন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। তাই দুর্গম অরণ্যে, দুর্লঙ্ঘ্য গিরিচূড়ায়, মৃত্যুনীল ভয়ভীষণ সমুদ্রগহ্বরে তারা ছুটে যায় এই জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করবার জন্য। কতবার কত বিপদের মাঝে তারা পড়েছে, কত লোক প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু তবুও তাদের ভয়

নেই, ডর নেই ; তারা অচল অটল কর্তব্যসাধনে। জ্ঞানের যে পথ ধরে চলতে চলতে তারা মরে যায়, সেই পথ ধরেই আবার তাদের পিছনে পিছনে আসে আর একদল লোক। একদল চলে যায় আবার একদল আসে। মানব সভ্যতার, মানব ইতিহাসের এই সনাতন নিয়ম।

সেই সময় বিলাত থেকে এলো একদল বৈজ্ঞানিক ভারতবর্ষে হিমালয়ের ঐশ্বর্য দেখবে ব'লে—কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী, অগণিত বৃক্ষলতা তার রহস্যময় অন্তরে বাস করে, তার হিসাবনিকাশ করবার জন্য তাদের কৌতূহল, তাদের এই উদ্যোগ ও ভ্রমণের আয়োজন।

বাংলা দেশের মধ্য দিয়ে তাঁরা নেপালের পথ ধরলেন। প্রফেসর হ্যামিল্‌টন হলেন এই দলের প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর সঙ্গে এসেছেন আরো তিনজন সহকারী বৈজ্ঞানিক—ডেভেন্‌হ্যাম, রিচার্ডসন্ ও নিকল্‌সন্ এবং জনচারেক খানসামা ও বাবুর্চি। তাঁদের সকলের কাছেই আছে বন্দুক ও গুলিবারুদ। তাঁরা শিকারী নন তবু আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা তাঁরা সেগুলি ব্যবহার করেন এবং নিজেদের কাছে কাছে রাখেন। অনেকবার তাঁরা নিজেদের প্রাণরক্ষা করেছেন এই বন্দুক দিয়ে। কিন্তু শুধু চারজনে মিলে যে হিমালয়ের বিরাট অরণ্যের মধ্যে যাওয়া যায় না এ কথা তাঁরা খুব ভাল ক'রেই জানতেন। তাই বাংলা দেশ থেকে বিখ্যাত বারো জন শিকারী ও জন-কুড়ি অত্যন্ত সাহসী ও জোয়ান কুলী সংগ্রহ করলেন।

তারপর সাজ সাজ রব পড়ে গেল। তাঁবু, বিছানা, খাদ্যসামগ্রী, গুলিবারুদ, বন্দুক, পাচক, লোকলস্কর নিয়ে সাহেবরা রওনা হলেন।

কিন্তু বিপদ হ'লো ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে নিয়ে। তাঁর একমাত্র কন্যা লিলি আবদার ধরে বসলো তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য। যদিও এর আগে বহুবার বহু শিকারযাত্রায় তিনি তাঁর আদরিণী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, তবুও এবার তাকে নিয়ে যেতে কেমন তাঁর অনিচ্ছা হ'লো। বিবাহযোগ্যা কন্যা—একদিকে তার বিবাহের কথাবার্তা চলছে, তার ওপর আবার হিমালয়ের অভ্যন্তরে কতদিন যে থাকতে হবে তাই বা কে জানে! হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে ইতিপূর্বে তিনি কখনো শিকার করতে যাননি এবং সেখানকার সম্বন্ধে একটা দারুণ ভীতি ছিল তাঁর। তাই নিজে গেলেও একমাত্র কন্যাকে নিয়ে যেতে রাজী হলেন না।

মাতৃহীনা কন্যা শৈশব থেকেই পিতাকে একমাত্র আশ্রয় ব'লে জানে, সর্বদা তাঁর চোখে চোখে থাকে, কখনো তাঁর কাছছাড়া হয়নি। ক্যাপ্টেন চৌধুরীও লিলিকে বুকে ক'রে মানুষ করেছেন এবং একসঙ্গে পূর্ণ করেছেন তার মা-বাপের অভাব। লিলি তাঁর নয়নের নিধি, অন্তরের ধন। তার কোন বাসনা, কোন কামনা তিনি কখনো অপূর্ণ রাখেননি।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী বিখ্যাত শিকারী, ভারতজোড়া তাঁর নাম। যখন-তখন যেখানে সেখানে রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে, ধনী জমিদারদের সঙ্গে শিকারে যান। শিকারে তাঁর আনন্দ, শিকারে তাঁর গর্ব। কত বাঘ, কত সিংহ, কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর জন্তু-জানোয়ার তিনি হত্যা করেছেন নিজ হাতে এবং কতবার এই হিংস্র বন্য পশুদের মুখ থেকে রক্ষা করেছেন বিপন্ন রাজা-মহারাজাদের। বার বার তাঁর

পৌরুষ তাঁকে অভিনন্দিত করেছে ; অজস্র প্রশংসায় অযাচিত যশোগরিমায় তাঁর কর্ণ মুখর হয়ে উঠেছে এবং বহু অর্থ তিনি উপার্জ্জন করেছেন। সুন্দরবনের জঙ্গলে একবার বাঘের মুখ থেকে তিনি বাঁচিয়েছিলেন এক গভর্নরকে এবং সেই নিশ্চিত মৃত্যু থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য তিনি 'ক্যাপ্টেন' উপাধি লাভ করেন। তাই লিলি যখন এবার তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য ধরে বসলো তিনি মেয়ের মনে বিশেষ কষ্ট না দিয়ে প্রফেসর হ্যামিলটনকে চিঠি লিখলেন, কোন অনিবার্য কারণে তাঁর যাওয়া হ'লো না।

এই সংবাদ পেয়েই প্রফেসর হ্যামিলটন মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। তিনি জানতেন ক্যাপ্টেন চৌধুরীর মূল্য তাঁর কাছে কত বেশী এবং তিনি না গেলে হয়ত তাঁর গবেষণা সম্পূর্ণ হবে না। তাই তিনি অবিলম্বে ক্যাপ্টেন চৌধুরীর বাড়ীতে নিজে গিয়ে হাজির হলেন।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী তাঁকে আদর-আপ্যায়ন ক'রে বসালেন এবং একে একে সব কথা খুলে বললেন।

প্রফেসর হ্যামিলটন তাঁকে অনেক অনুনয় বিনয় করলেন এবং বললেন, তিনি না গেলে তাঁর এ কার্য অসম্পন্ন থেকে যাবে।

অবশেষে ক্যাপ্টেন চৌধুরী রাজী হলেন। এবং স্থির হ'লো লিলিও যাবে তাঁর বাপের সঙ্গে। বাড়ীর পুরানো চাকর মধু, ছেলেবেলা থেকে যার কোলেপিঠে চড়ে লিলি মানুষ হয়েছে, ক্যাপ্টেন চৌধুরী তাকেও সঙ্গে নিলেন। বহুবার বহু শিকারযাত্রায় সে-ই হয়েছে লিলির সাথী।

লিলি দুরন্ত মেয়ে। শিকারে যাবার নাম শুনলে আনন্দে তার প্রতি অঙ্গ নাচতে থাকে। বনের প্রতি তার আকর্ষণ ছেলেবেলা থেকে। কত বাঘের ডাক সে শুনেছে, কত হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের রক্ত নিয়ে সে হাসিমুখে পায়ে আলতা পরেছে। পিতার সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে সে ভালবাসে। বনে গিয়ে তাঁবুর মধ্যে বাস করতে তার খুব আনন্দ।

যারা শিকারী বা যারা শিকারীর সঙ্গে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তাদের মজা হচ্ছে এই যে, যখনই তারা শোনে কেউ বনে যাচ্ছে বা তাদের কাছে কোন নিমন্ত্রণ এসেছে শিকারে যাবার, তারা কিছুতেই তখন স্থির থাকতে পারে না। তাদের পা সুড়সুড় করে। শিকারের নেশা ভয়ানক নেশা। আর যে কোন নেশার মত একবার তা মানুষকে পেয়ে বসলে ছাড়ানো ভারী শক্ত।

তাই ক্যাপ্টেন চৌধুরী প্রফেসর হ্যামিলটনের অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, লিলি বড় হয়েছে, এখন তাকে বনেজঙ্গলে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, একথা আর একবারও বিবেচনা না ক'রে তখনি কন্যাকে নিয়ে রওনা হলেন।

কলকাতা থেকে তাঁরা সকলে যাত্রা শুরু করলেন এবং প্রায় পনেরো দিন পরে গিয়ে হাজির হলেন নেপালের অরণ্যে।

তাঁবু পড়লো সারি সারি।

জঙ্গলের মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার, গাছপালা কম, এমন জায়গায় কোদাল ও কুড়ুল দিয়ে তখনি মজুররা সাফ ক'রে দিলে। কাঠ সংগ্রহ ক'রে আনলে তারা এদিক ওদিক থেকে। আগুন জ্বালিয়ে খানসামা, বাবুর্চি ও হিন্দু ঠাকুররা রান্না চাপিয়ে দিলে। সঙ্গে চাল ডাল আটা ময়দা ঘি তেল ও সাহেবদের রুটিমাখন প্রভৃতি যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী, যতদূর পর্যন্ত বয়ে আনা যায়, সবই তাঁরা এনেছিলেন। ক্যাপ্টেন চৌধুরী ও প্রফেসর হ্যামিলটন দু'একজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে বনের মধ্যে ঘুরতে লাগলেন, খাবার জন্য দু'একটা পাখী শিকার করবার জন্য।

দ্যুম্ দ্যুম্ দ্যুম্ দ্যুম্ ক'রে পর পর কয়েকটা গুলির আওয়াজ হ'লে। নিস্তব্ধ বন ও উঁচুনিচু পাহাড়ের মধ্যে সেই শব্দ ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে কোথায় মিলিয়ে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা ফিরে এলেন প্রায় কুড়িটা পাখী শিকার ক'রে।

চাকরেরা তৎক্ষণাং লেগে গেল সেই পাখীগুলোর ছাল ছাড়িয়ে মাংস তৈরী করতে। কিছুক্ষণ পরে রান্না শেষ হ'লো। যে যার তাঁবুর মধ্যে খেতে বসে গেল। খাওয়াদাওয়া শেষ হ'লে তাঁরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। সাহেবরা খাতাপত্তর বার ক'রে লিখতে লাগলেন তাঁদের যাত্রার বিবরণ, জঙ্গলের রূপ এবং তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার খসড়া।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী ও তাঁর কন্যা লিলি ততক্ষণ একটা ঘুম দিয়ে নিলে এবং মধু চাকর তাঁদের তাঁবুটা ভাল ক'রে গোছাতে লাগল। এদিকে অন্যান্য শিকারীরাও যে যতটা পারলে নিজেদের তাঁবুতে ঘুমিয়ে নিলে। কারণ রাত্তিরটা তাদের কাছে ভয়ানক। যত হিংস্র জন্তু-জানোয়ার বেরোয় রাত্রের অন্ধকারে। আর তারা আসে নিঃশব্দে, চুপিচুপি। সেই সময় থাকতে হয় তাদের সতর্ক। হয়ত সারারাত্রি বন্দুক হাতে ক'রে তারা বসে থাকে জেগে ; কখনো বা একজন একজন ক'রে পাহারা দেয়, আর কখনো একজন একজন ক'রে ঘুমোয়। তাই সুবিধা পেলেই তারা ঘুমিয়ে নেয়।

সেইদিনই বেলা তিনটের সময় প্রফেসর হ্যামিলটন তাঁর দলবল নিয়ে বেরুলেন বৈজ্ঞানিক গবেষণায়। শিকারীরা সব বন্দুকগুলি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে চলতে লাগল সামনে ও পিছনে। ক্যাপ্টেন চৌধুরীর গলায় গুলি ও বারুদের মালা এবং হাতে বন্দুক। লিলিরও হাতে একটা বন্দুক। পিতার পিছনে পিছনে চলেছে সে। রাঁধুনী ও চাকরবাকরেরা আছে তাঁবুতে, কয়েকজন শিকারীও আছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য।

নতুন অরণ্য, নতুন স্থান। এখানকার গাছপালা, এখানকার জীবজন্তু সবই তাঁদের কাছে অপরিচিত। কে কোথায় কি ভাবে থাকে বা আছে কিছুই তাঁদের কারো জানা নেই। তাই অতি সাবধানে তাঁরা চলাফেরা করতে লাগলেন।

গভীর থেকে তাঁরা গভীরতর অরণ্যে ঢুকতে লাগলেন। যেতে যেতে প্রফেসর হ্যামিলটন, ডেভেনহ্যাম, রিচার্ডসন ও নিকলসন বৃক্ষলতা পরীক্ষা করতে লাগলেন, তাদের ফটো তুলতে লাগলেন এবং মাঝে মাঝে নোটবই বার ক'রে লিখতে লাগলেন তাদের বিবরণ।

শিকারীদের ঘ্রাণশক্তি ভারী তীব্র। তারা বন্যজন্তুদের গন্ধে সচকিত হয়ে ওঠে। তাই

হঠাৎ এক জায়গায় আসতেই ক্যাপ্টেন চৌধুরী সকলকে সাবধান ক'রে দিয়ে বললেন, আর এক পা এগিয়ে গেলেই বিপদ। এখান থেকে শীঘ্র ফিরে চলুন মিঃ হ্যামিলটন।

রিচার্ডসন ছিলেন ঠিক লিলির পিছনে, ক্যাপ্টেন চৌধুরীর কাছ থেকে তৃতীয় ব্যক্তি। তিনি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি ?

ক্যাপ্টেন চৌধুরী ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন, বাঘের গন্ধ পাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে গভীর হুঙ্কার ছেড়ে একটা বিরাট বাঘ পাহাড়ের ওপর থেকে একেবারে লাফিয়ে পড়লো রিচার্ডসনের ঘাড়ে, সকলের হাতে ছিল বন্দুক প্রস্তুত। একসঙ্গে তাঁরা সকলে গুলি করলেন সেই বাঘটাকে। সাতটা গুলি একই সময়ে গিয়ে লাগল তার মাথায়। বাঘটার মাথার খুলি ছাতু হয়ে গেল। মরে গেল সে তখনি।

একটা থাবা মেরে রিচার্ডসনের ঘাড় থেকে একখাবলা মাংস তুলে নিয়েছিল বাঘটা। ঝর্ ঝর্ ক'রে সেইখান দিয়ে রক্ত পড়ছিল এবং তার যন্ত্রণায় তিনি অবসন্ন হয়ে পড়লেন।

সকলে ধরাধরি ক'রে রিচার্ডসনকে তাঁবুতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল এবং সেখানে গিয়েই প্রফেসর হ্যামিলটন্ একটা বিরাট ওষুধের ব্যাগ বার ক'রে তুলো, টিনচার আইওডিন দিয়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিলেন সেই ক্ষতস্থানটি এবং একটা শিশি থেকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি গেলাসে ঢেলে তাঁকে খাইয়ে দিলেন। রিচার্ডসন সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। একটা চাকর তাঁর মাথায় বাতাস দিতে লাগল।

রাত্তির হ'লো। বড় বড় কাঠ তাঁবুর চারদিকে জ্বালিয়ে তাঁরা এক-একজন ক'রে জেগে রইলেন— বন্দুক নিয়ে সর্তক হ'য়ে। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের কত কোলাহল, কত বিচিত্র ডাক, অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে তাঁদের কানে আসতে লাগল। প্রফেসর হ্যামিলটন একেবারে ঘুমুতে পারলেন না। রাত্রে মাঝে মাঝে তিনি চম্‌কে উঠতে লাগলেন দুঃস্বপ্ন দেখে।

পরদিন ভোর হ'তেই পাখীর কলকূজনে তাঁদের ঘুম ভেঙে গেল। দেখতে দেখতে প্রভাতের সোনালী আলোয় সমস্ত বনভূমি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। চায়ের সঙ্গে অল্প কিছু জলখাবার খেয়ে তাঁরা আবার বেরুলেন অরণ্য পরিদর্শনে। এবার আর তাঁরা সেদিকে গেলেন না। নতুন একটা পথ বেছে নিয়ে সেইদিকে যেতে লাগলেন। কিন্তু পথ কোথায় ? পথ ব'লে কিছুই সেখানে নেই। এর আগে কোন মানুষ বোধ হয় সেখানে পদার্পণ করেনি। তাই নিজেরা যে পথে যান বনজঙ্গলে ঠেলতে ঠেলতে, আবার সেই পথেই পায়ের দাগ দেখে দেখে ফিরে আসেন। অনেক সময় তাঁরা ভারী বিপদে পড়েন ; কোন্ পথে গিয়েছিলেন চিনতে পারেন না। সামনে পিছনে চললো শিকারীরা। বেলা বারোটার সময় তাঁরা সকলে ফিরে এলেন কতকগুলো পাখী ও একটা হরিণ শিকার ক'রে।

পাচকরা আগে থেকে রান্নার সব ঠিক ক'রে রেখেছিল। মাংস আসতেই তখনি তারা ছাড়িয়ে রান্না চাপিয়ে দিলে। বেলা দেড়টার সময় সকলের খাওয়া শেষ হ'লো। দু'ঘণ্টা বিশ্রাম করবার পর আবার প্রফেসর হ্যামিলটন প্রস্তুত হলেন। ক্যাপ্টেন চৌধুরীও হাফপ্যাণ্ট, মোজা, বুটজুতো এঁটে, বারুদের মালা গলায় ঝুলিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন। অন্যান্য শিকারীরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হলেন

সেজেগুজে। লিলি তখন ঘুমোচ্ছিল, তাই ক্যাপ্টেন চৌধুরী তাকে আর ডাকলেন না। সে তাঁবুতে রইল, সকালে অনেক ঘুরে বেচারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

হ্যামিলটন বললেন, মিঃ চৌধুরী, তোমার মেয়ের বয়স কত?

চৌধুরী বললেন, তেরো।

আশ্চর্য্য! এতটুকু মেয়ের এ-রকম অদ্ভুত সাহস আমি আর কখনো দেখিনি; সত্যি বাঙালীর মেয়ে ব'লে ওকে ভুল হয়। আমাদের দেশে এতটুকু মেয়ের এতখানি সাহস কদাচিত দেখতে পাওয়া যায়।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী তখন হাসতে হাসতে বললেন, আমারই মেয়ে তো! বাঘের বাচ্ছা বাঘই হয়। ভয়ডর কাকে বলে, আমার মেয়ে ছেলেবেলা থেকে তা একেবারে জানে না।

তারপর কতটুকু বেলা থেকে তিনি কন্যাকে সঙ্গে ক'রে বনে বনে ঘুরছেন এবং কিভাবে হাতে ধরে তাকে বন্দুক ছুঁড়তে শিখিয়েছেন, সেই সব গল্প করতে করতে তাঁরা পথ চলতে লাগলেন।

লিলির ছেলেবেলার ইতিহাস শুনে প্রফেসর হ্যামিলটন অবাক হয়ে গেলেন এবং ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তার ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে কি চিন্তা করেছেন? বড় হয়ে লিলি কী করবে? তার জীবনের আদর্শ কী?

—আদর্শ? আদর্শ আত্মরক্ষা, আদর্শ নিজের দেশকে রক্ষা, আদর্শ নারীজাতির সম্ভ্রম, নারী-জাতির মানমর্যাদা রক্ষা করা।

এই কথা বলতে বলতে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, জানেন মিঃ হ্যামিলটন, আজ নারীর লাঞ্ছনা, নারীর অবমাননা পৃথিবীর চারিদিকে; তাই আমি আমার মেয়েকে এমন শিক্ষা দিতে চাই যা দেখে সমস্ত নারীজাতি মনে করবে তারা দুর্ব্বল নয়, তারা পরমুখাপেক্ষী নয়। জগতের আদিশক্তি নারী। তাই আমরা শক্তিরূপিণী দেবীর পূজো করি, আরাধনা করি।

প্রফেসর হ্যামিলটন ক্যাপ্টেন চৌধুরীর মুখে এই সব কথা শুনে তাঁকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, এই তো বীরের উপযুক্ত বাণী। এই তো পিতার যোগ্য উপদেশ। ছেলেমেয়েদের মনে এইভাবেই তো একটা বড় কিছু আদর্শ জাগিয়ে দেওয়া উচিত প্রত্যেক বাপ-মায়ের।

কথা বলতে বলতে তাঁরা গিয়ে পড়েছিলেন একেবারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে। সামনেই একটা অদ্ভুত রকমের বিরাট গাছ দেখে সকলে থমকে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত মনযোগ সহকারে প্রফেসর হ্যামিলটন সেই গাছটাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। এমন সময় গাছের উপর ফোঁস ফোঁস ক'রে শব্দ হ'লো। তাঁরা সকলে চমকে উঠে ওপরের দিকে চেয়ে যা দেখলেন তাতে বিস্ময়ে তাঁদের বাক্‌রোধ হবার যোগাড়। গাছের যে ডালটার দিকে দেখেন সেই ডালেই জড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাপ কুণ্ডলীকৃত হয়ে। তারা যেমন মোটা তেমনি ভয়ঙ্কর। যেন সেটা সাপের আড্ডা। অগুনতি সাপ এসে বাসা বেঁধেছে সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সকলে বন্দুক ওঠালেন, কিন্তু হ্যামিলটন তাঁদের নিষেধ করলেন। এতগুলো সাপকে মিছিমিছি ঘাঁটিয়ে লাভ নেই—কোন্ দিক থেকে কে কার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে তা কে জানে!

এই ব'লে তাঁরা তখনি সে স্থান ত্যাগ ক'রে অন্যদিকে চলে গেলেন। বিচিত্র এই অরণ্য। বিচিত্র এর রহস্য। কত অগণিত পশুপক্ষী, কত অসংখ্য বৃক্ষলতা যে এর অন্তরে অন্তরে জড়িয়ে আছে তা নির্ণয় করা যেমন দুঃসাধ্য তেমনি ভয়াবহ। সেখানকার বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, বিপদ-আপদ, নিত্য নূতন রূপ ধরে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। আজ যাদের তাঁরা দেখেন, কাল আর তাদের খুঁজে পান না।

অরণ্যের এই নব নব পরিবর্তন, নব নব বিস্ময়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিতে লাগল প্রফেসর হ্যামিলটন ও তাঁর সঙ্গীদের চোখে। হিমালয়ের এই বিরাটত্ব, হিমালয়ের এই অফুরন্ত ঐশ্বর্য দেখে তাঁরা শিউরে উঠলেন, আরো বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

একদিন দু'দিন ক'রে দু'মাস কেটে গেল।

প্রফেসর হ্যামিলটনের খাতা ভরে উঠলো নব নব অভিজ্ঞতায়। তিনজন শিকারী প্রাণ দিল হিংস্র জন্তুর কবলে ; পাঁচজন মজুর আহত হ'লো এবং কতশত জন্তু-জানোয়ার যে মারা পড়লো তাঁদের হাতে তার ঠিক নেই। প্রাণসংহারের এই বীভৎস দৃশ্য, মৃত্যু-লীলার এই নৃশংস চিত্র আঁকতে গিয়ে বার বার তাঁর হাত কেঁপে উঠলো।

তবুও চললো তাঁদের গবেষণা। মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। জ্ঞানের পিপাসা তাদের মেটে না। তাই এত বিপদ, এত বাধা সত্ত্বেও তাঁরা ক্ষান্ত হন না।

এদিকে দু'মাস এক জায়গায় থাকবার ফলে লিলি রীতিমত পথঘাট চিনে নিয়েছিল এবং যেদিন তাকে বাসায় রেখে তার বাবা শিকারে চলে যেতেন, সে একটা বন্দুক নিয়ে তার পুরোনো চাকর মধুর সঙ্গে কাছাকাছি জঙ্গলে গিয়ে পাখী শিকার করতো, হরিণ শিকার করতো। কখনো কখনো বা অন্য শিকারী যারা থাকতো তাঁবু পাহারা দেবার জন্য, তাদেরও দু'একজনকে সঙ্গে নিয়ে সে একটা ছোটখাটো দল গঠন ক'রে যেতো শিকারে—অবশ্য কাছাকাছি জঙ্গলে। চঞ্চল মেয়ে, সাহসী মেয়ে লিলি, চুপ ক'রে বসে থাকা তার স্বভাব নয়। জঙ্গলের মধ্যে বন্দুক হাতে ক'রে ঢুকলে যেন লিলিকে আর চেনা যেতো না—তার চেহারা যেতো বদলে। সবাই অবাক হয়ে দেখতো তার এই অদ্ভুত সাহস। শিকারীরা বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে চলতো তার পিছনে পিছনে এবং বেশীদূর বা গভীর কোন জঙ্গলের মধ্যে তাকে ঢুকতে দিতো না।

একদিন একটা হরিণকে লক্ষ্য ক'রে ছুটতে ছুটতে লিলি একলা একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়লো এবং যেই দ্রুম্ ক'রে একটা গুলি ছুঁড়েছে অমনি একটা বিকট আওয়াজ তার কানে এলো পিছন থেকে। তাড়াতাড়ি বন্দুকটা ঘুরিয়ে পিছন ফিরতেই সে দেখলে বিরাট একটা গরিলা হাঁ ক'রে ছুটে আসছে তার দিকে। তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল এবং হাত-পা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল। তবুও সাহসে ভর ক'রে সে তখুনি আবার গুলি ছুঁড়লে—দ্রুম, দ্রুম, দ্রুম। পর পর তিনটে গুলির আওয়াজে সমস্ত অরণ্য কেঁপে উঠলো। কিন্তু ব্যর্থ হ'লো লিলির সকল লক্ষ্য ; সব

গুলিগুলো বেরিয়ে গেল গরিলাটার কানের পাশ দিয়ে।

তখন লিলি হামিদ-হামিদ, মধু-মধু, ক'রে চীৎকার করতে লাগল এবং সঙ্গী শিকারীদের ডাকতে ডাকতে ছুটোছুটি করতে লাগল বনের মধ্যে।

শিকারীরা লিলির ডাক শুনতে পেয়েছিল এবং পর পর কয়েকটা গুলির আওয়াজও তাদের কানে এসেছিল। কিন্তু এমনি রহস্যময় অরণ্য এবং এমনি বিশ্বাসঘাতক তার গাছপালা, ঝোপ-ঝাড় যে একই বনের মধ্যে থেকেও কেউ কাউকে খুঁজে পায় না। তাই লিলি নিশ্চিত বিপদের মুখে পড়েছে জানতে পেরে মধু ও শিকারীরা লিলি লিলি ক'রে পাগলের মত ছুটতে লাগল বনের মধ্যে। কিন্তু কোন্ দিক থেকে যে লিলি তাদের ডাকছে তা তারা কিছুতেই হদিস করতে পারলে না। সেই পর্বতময় অরণ্যের মধ্যে তাদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে যেন তাদের বিভ্রান্ত ক'রে দিতে লাগল। যেদিকে গিয়ে তারা ডাকে লিলি ব'লে, মনে হয় ঠিক তার উল্টো দিক থেকে যেন লিলি তাদের ডাকছে। এইভাবে দিশেহারা হয়ে মধু ও অন্যান্য শিকারীরা ছুটোছুটি করতে লাগল বনের মধ্যে।

সুচাঙ্ তখন সেইখান দিয়ে বনের মধ্যে কোথায় যাচ্ছিল। তার হাতে ছিল তীর-ধনুক। গোলমাল শুনে নীচের দিকে চাইতেই চমকে উঠলো লিলিকে দেখে। ফুটফুটে পদ্মফুলের মত মেয়েটি ভয়ার্ত হয়ে ছুটেছে এবং তার পিছনে পিছনে সেই ভীষণ গরিলা। তৎক্ষণাৎ সুচাঙ্ ধনুকে তীর লাগিয়ে গরিলাটাকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়লে। তীরটা গিয়ে একেবারে তার বক্ষে বিদ্ধ হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ হুঙ্কার দিয়ে গরিলাটা পড়ে গেল সেখানে এবং দেখতে দেখতে তার হাত-পা সব স্থির ও কঠিন হয়ে গেল।

লিলি পিছন ফিরে দেখলে পাহাড়ের মত পড়ে আছে গরিলাটা। আর তার বুক দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরুচ্ছে। সে মনে করলে বোধ হয় হামিদ কিংবা তার সঙ্গী অপর কোন শিকারী তাকে গুলি মেরেছে, কিন্তু তার কাছে যেতেই লিলির সে ভুল ভাঙলো। সে দেখলে একটা তীর বিঁধে আছে তার বুকে। সঙ্গে সঙ্গে তার গা-টা কেমন ছমছম ক'রে উঠলো। তীর! কে মারলে তীর? কোথা থেকে এল এই তীর? এই কথা ভাবতে ভাবতে সে ওপরের দিকে চেয়ে গাছপালাগুলো দেখতে লাগল ভাল ক'রে। কিন্তু কই, কাউকে তো সে সেখানে দেখতে পেলে না?

তখন সে আবার প্রাণপণে চীৎকার ক'রে উঠলো হামিদ-হামিদ, মধু-মধু ব'লে।

যেই একবার মধু বলেছে, অমনি কে পিছন দিক থেকে তার মুখে একটা হাত চাপা দিলে।

চম্‌কে উঠে লিলি পিছন ফিরতেই একেবারে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। হাতে তীর-ধনুক নিয়ে ঠিক তার পিছনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি যুবক, সাদা পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত—একেবারে উলঙ্গ, শুধু একটু বাঘছালের কৌপীন আঁটা তার কোমরে, হাতে একটা তামার কালো মাদুলী, গলায় কতকগুলো হাড়ের মালা; বিরাট ছ'ফুট লম্বা তার দেহ, কঠিন ও পেশীবহুল; মাথার চুলগুলো কটা এবং জট ধরেছে তাতে—লিলির মুখের দিকে সে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছে।

ভয়ে, বিস্ময়ে, সঙ্কোচে প্রথমটা লিলি যেন জড় হয়ে গেল। অথচ যে এইমাত্র তাকে মৃত্যুর

মুখ থেকে রক্ষা করলে, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য সে প্রাণপণে শক্তিসঞ্চয় করতে লাগল। কিন্তু মুখ দিয়ে তার কোন কথা বেরুল না। শুধু ঠোঁট হু'টো বারকয়েক কেঁপে উঠলো। তারপর অতি কষ্টে তার মুখ দিয়ে দুটি কথা বেরুল, কে তুমি?

সুচাঙ্ অবাক্ হয়ে লিলিকে দেখছিল। এত সুন্দর মেয়ে এত সুন্দর মানুষ তার জীবনে সে আর কখনো দেখেনি এবং মানুষের ভাষা, মানুষের কথাও সে জীবনে আর কখনো শোনেনি। তাই লিলির এই মধুর কণ্ঠস্বর শুনে সে শুধু একটু হাসলো। মানুষের ভাষা সে তো জানে না, বোঝে না।

তাই তাকে হাসতে দেখে লিলি আবার জিজ্ঞেস করলে, কে তুমি আজ আমার প্রাণরক্ষা করলে?

সুচাঙ্ আবার তেমনি ভাবে হাসলো। লিলির কথার একবর্ণও সে বুঝতে পারলে না। লিলির তখন বুকে একটু সাহস হ'লো। সে আবার বললে, কে তুমি, বলো?

একই কথা বার বার শুনে স্পষ্ট ও জড়িত কণ্ঠস্বরে তার কথাকেই পুনর্বার উচ্চারণ করলে সুচাঙ্—কে—কে, তু—তু—মি?

লিলি বললে, আমি লিলি।

লি—লি। সুচাঙ্ এই কথাটা খুব স্পষ্ট ক'রে উচ্চারণ করলে। জীবনে এই প্রথম তার মুখ দিয়ে স্পষ্ট কথা বেরুল। এই প্রথম সে বললে মানুষের ভাষা। তারপর সে আপন মনেই দু'তিনবার উচ্চারণ করলে, লিলি, লিলি, লিলি।

তার এই অদ্ভুত কথা বলবার ধরণ এবং অদ্ভুত হাসবার ভঙ্গী দেখে লিলির মনে কেমন ভয় হ'লো। তার মনে হ'তে লাগল, লোকটা কি মানুষ নয়? কিংবা মানুষের মত দেখতে কোন হিংস্র বন্য জন্তু? বনের মধ্যে কত রকমের জানোয়ার আছে কে তার খোঁজ রাখে! এই কথা ভাবছে, এমন সময় সুচাঙ্ খপ্ ক'রে লিলির একটা হাত ধরে ফেললে।

লিলি ভয়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠলো এবং দু'পা পিছিয়ে গিয়ে হাতটা তার হাতের মধ্যে থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এমনি তার বজ্রমুষ্টি যে, লিলির মত তেরো বছরের মেয়ের পক্ষে তা খোলা একেবারে অসম্ভব।

লাগে, হাত ছাড়ো বলছি! এই ব'লে লিলি টানতে লাগল তার হাতখানা।

এমন সময় হৈ-হৈ ক'রে হামিদ, মধু ও অন্যান্য শিকারীরা সেখানে এসে পড়লো। তাদের আসতে দেখেই সুচাঙ্ লিলির হাত ছেড়ে দিলে এবং এক লাফে একেবারে গাছের ওপর উঠে পড়লো। তারপর একটা ডাল থেকে আর একটা ডালে দুলতে দুলতে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হামিদ ও অন্যান্য শিকারীরা দূর থেকে সুচাঙ্কে গাছের ওপর লাফাতে দেখে দুম দুম ক'রে দুটো গুলি ছুঁড়লে তাকে লক্ষ্য ক'রে। কিন্তু দু'টোর একটাও তার গায়ে লাগল না। সে তখন লুকিয়ে পড়েছে কোন গাছের আড়ালে। মানুষের মত দেখতে অথচ গাছের ডালে ডালে এত দ্রুত লাফিয়ে চলে, এরকম অদ্ভুত জানোয়ার দেখে তারা সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল।

বন্দুকের আওয়াজে সুচাঙের বুক কেঁপে উঠলো। এটা আবার কি অদ্ভুত জিনিস সে ভাবতে লাগল।

লিলি তখন যা যা হয়েছিল সব কথা তাদের বললে। তারা আশ্চর্য হয়ে শুনতে লাগল সেই মানুষবেশী অদ্ভুত জানোয়ারের কাহিনী।

তাঁবুতে ফিরে গিয়ে তারা দেখলে প্রফেসর হ্যামিলটন ও ক্যাপ্টেন চৌধুরী তাঁদের দলবল নিয়ে ফিরে এসেছেন এবং লিলিদের ফিরতে এত দেরি হ'চ্ছে দেখে তাঁরা সকলে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। লিলি ছুটে গিয়ে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরলে এবং কেন তাদের এত দেরি হ'লো সব কথা একে একে বললে।

প্রফেসর হ্যামিলটন ও ক্যাপ্টেন চৌধুরী এই মানুষবেশী অদ্ভুত জানোয়ারটির কথা শুনে অবাক্ হয়ে গেলেন এবং স্থির করলেন কাল সকালে উঠেই দলবল নিয়ে তার অনুসন্ধান করবেন।

এদিকে সুচাঙ্ করলে কি, গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে লিলি ও তার দলের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। এই রকম অদ্ভুত সুন্দর জীব সে তার জীবনে আর কখনো দেখেনি। তাই এই শিক্ষিত, সুসভ্য বেশভূষায় সুসজ্জিত মানুষ দেখে তার কৌতূহল হ'লো। সে চুপি চুপি তাদের পিছনে পিছনে এসে দেখলে লিলিরা ঢুকলো তাঁবুতে। সেখানে আরো কত তাঁবু, আরো কত লোক—তার চেয়ে তারা আরো সুন্দর, আরো সুশ্রী এবং কত অদ্ভুত তাদের বেশভূষা!

সুচাঙের মাথা ঘুরে গেল। সে আহার-নিদ্রা ভুলে গিয়ে সেখানে ব'সে চুপচাপ তাদের লক্ষ্য করতে লাগল।

তারা একে একে গা থেকে জামাকাপড় খুলে কেউ স্নান করলে তোলা জলে, কেউ বা হাওয়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগল। তারপর আহার প্রস্তুত হ'লে সবাই খেতে বসলো।

সুচাঙ্ তার নিজের দেহের সঙ্গে তাদের দেহের অদ্ভুত মিল দেখে অবাক হয়ে গেল। তাদেরও মুখ-চোখ যেমন, তারও সেইরকম। তবে কি তারাই তার আপনজন? তারাই কি তার আত্মীয়? এই কথা সে বার বার ভাবতে লাগল।

তার দলের বনমানুষদের ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারদের অতি কুৎসিত, অতি কদর্য ব'লে তার মনে হ'তে লাগল। একদৃষ্টে সে চেয়ে রইল তাঁবুর দিকে। তারা তার কাছে বিস্ময়, তারা তার কাছে পরম রমণীয় পদার্থ।

বিকেল হ'লো। আবার তারা সকলে বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে বন্দুক নিয়ে চললো বনের মধ্যে। লিলি গেল না। সে রইল বাসায়। সুচাঙ্ তাদের পিছনে পিছনে চললো। কিছুদূর যাবার পর হ্যুম ক'রে একটা আওয়াজ হ'লো, সঙ্গে সঙ্গে একটা হরিণ মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট করতে লাগল। তার সর্বাঙ্গ রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল। একে বন্দুকের শব্দ শুনেই সুচাঙের বুকটা কেঁপে ওঠে, তার ওপর আবার যখন সে দেখলে হরিণটা মরে গেল তখন তার বুঝতে বাকী রইল না যে, বন্দুকটা একটা মারণ-অস্ত্র। সেইদিন থেকে বন্দুকটা তার কাছে একটা ভয়াবহ জিনিস হয়ে দাঁড়ালো এবং যে

লোকগুলোর হাতে বন্দুক, তাদের তার মনে হ'লো সাক্ষাৎ যম। তাই সে ভারী চটে গেল তাদের সকলের ওপর এবং ভয়ে তখনি সে স্থান পরিত্যাগ ক'রে চলে গেল নিজের বাসায়। চার-পাঁচদিন আর সুচাঙ্‌ সে বনের দিকে গেল না।

এদিকে চার-পাঁচদিন ধরে সেই অদ্ভুত মানুষরূপী জানোয়ারটিকে খোঁজ ক'রে বেড়াতে লাগলেন মিঃ হ্যামিলটন ও ক্যাপ্টেন চৌধুরীর দল। কিন্তু কোথাও তার সাক্ষাৎ মিলল না। শেষে বিরক্ত হয়ে তাঁরা আবার নিজেদের কাজে মন দিলেন।

পরদিন শিকারীদের সঙ্গে জঙ্গলের কাজ শেষ ক'রে ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ তাঁরা পথ ভুল ক'রে এমন একটা জায়গায় এসে পড়লেন যেখানে শুধু বিরাট বিরাট পর্বতের গুহা ও অন্ধকারময় ঝোপ-ঝাড়। ক্যাপ্টেন চৌধুরী সকলকে সাবধান ক'রে দিলেন। তাঁরা সকলে পা টিপে টিপে বন্দুক প্রস্তুত ক'রে চলতে লাগলেন। খস্‌ খস্‌ ক'রে দ্রুত চলে যাওয়ার দু'একটা শব্দ তাঁদের কানে গেল।

কয়েক পা যেতেই একটা সিংহ গর্জন ক'রে উঠলো। সমস্ত অরণ্য প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল সেই ডাকে। কোন্‌ দিক থেকে যে শব্দ হ'লো কিছুই তাঁরা স্থির করতে পারলেন না।

শুধু ক্যাপ্টেন চৌধুরী চেঁচিয়ে বললেন, সর্বনাশ! একেবারে সিংহের গহ্বরের মধ্যে আমরা এসে পড়েছি। যে যেদিক দিয়ে পারো পালাও—দেরি করলে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

তৎক্ষণাৎ শিকারীরা পাঁচটা দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন এবং হ্যামিলটন, নিকলসন, রিচার্ড-সন, রবার্টসন প্রভৃতি এক-একজন এক-একটা শিকারীর সঙ্গে বন্দুক হাতে ক'রে ছুটতে লাগলেন। কোন্‌ দিকে পথ কারো জানা নেই। তবু যে যেদিকে পারলে প্রাণভয়ে ছুটলো।



ক্যাপ্টেন চৌধুরী চেঁচিয়ে বললেন, সর্বনাশ! একেবারে সিংহের গহ্বরের মধ্যে আমরা এসে পড়েছি।...

একটা সিংহ একেবারে এসে পড়েছিল নিকলসনের সামনে। তিনি দ্যুম্ দ্যুম্ ক'রে একসঙ্গে দুটো গুলি ছুঁড়লেন এবং তাঁর সঙ্গের শিকারীও তাকে দুটো গুলি মারলেন। সিংহটা উত্থানশক্তি রহিত হয়ে সেইখানে প'ড়ে গর্জন করতে লাগল।

এদিকে বন্দুকের আওয়াজ হ'তেই আরো তিন-চারটে সিংহ একসঙ্গে তাদের বাসা থেকে বেরিয়ে প'ড়ে ছুটলো শিকারীদের পিছু পিছু। কে কোনটাকে সামলায়? সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো।

প্রফেসার হ্যামিলটন ছুটতে ছুটতে দল ছেড়ে একা একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। তাঁর হাত-পা তখন কাঁপছে, বন্দুক শক্ত ক'রে ধরবার ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। অথচ একটা সিংহ তেড়ে আসছে তাঁর পিছনে—এইবার নিশ্চিত মৃত্যু—এই মনে ক'রে তিনি মনে মনে যীশুখ্রীষ্টকে স্মরণ করতে লাগলেন। এমন সময় দৈবপ্রেরিতের মত সুচাঙ্ একটা গাছের ওপর থেকে একেবারে লাফিয়ে পড়লো সেই সিংহের ঘাড়ে। অনেকক্ষণ ধরে ধস্তাধস্তি করবার পর সুচাঙ্ কোমর থেকে ছোরাটা বার ক'রে তার বুকে ঘা-কতক বসিয়ে দিলে। সিংহটার ঘাড় লটকে পড়লো। সে সুচাঙ্‌কে ছেড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো এবং গর্জন করতে করতে কিছুক্ষণ পরে মরে গেল।

সুচাঙের সমস্ত দেহ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। সিংহের নখারাঘাতে তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত। বেচারী সুচাঙ্! চার-পাঁচ দিন লিলিকে না দেখে তার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই সে তাদের তাঁবুর দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু লিলির দলের লোককে বিপদগ্রস্ত দেখে সে আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না—একেবারে লাফিয়ে পড়লো সিংহটার ঘাড়ে। তার মনে হ'লো এমন একটা সুন্দর মানুষকে এই বন্য জানোয়ারটা খেয়ে ফেলবে? তা হ'তেই পারে না—সে নিশ্চয়ই তাকে রক্ষা করবে। এই ক'দিন দিনরাত্তির সুচাঙ্ শুধু ভেবেছে লিলির কথা, তার দলের লোকদের কথা। কি সুন্দর তাদের বেশভূষা! সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিষ্ঠুরতার কথা মনে পড়েও তার অন্তরে ব্যথা লেগেছে। তার মনে হয়েছে লিলি নিষ্ঠুর! এই মানুষগুলো নিষ্ঠুর। তারা শত্রু তার নিজের—তারা শত্রু প্রতি জীবজন্তুর। সেই অরণ্যের শাখায়-প্রশাখায়, তৃণে-গুল্মে, প্রতি ধূলিকণায় জড়িয়ে আছে তাদের নৃশংস অত্যাচারের সহস্র সহস্র কাহিনী। সুচাঙ্ মনে মনে তাদের কত ঘৃণা করেছে, কত অভিসম্পাত দিয়েছে, কতবার ভেবেছে তীর মেরে তাদের শেষ ক'রে দিয়ে বাঁচাবে এই অরণ্যের নিরীহ সন্তানদের। কিন্তু হায়! সে তা পারেনি। যতবার তার মনে এই চিন্তা এসেছে, ততবার সেই নিষ্ঠুর মানুষদের প্রতি কোথা থেকে একটা মমতার ছায়া এসে পড়েছে তার অন্তরে। একটা অহেতুক আকর্ষণ সুচাঙ্ অনুভব করেছে তাদের প্রতি। সঙ্গে সঙ্গে তার মনের পরিবর্তন ঘটেছে—তাদের পাবার জন্য, তাদের সান্নিধ্যলাভ করবার জন্য তার অন্তর তৃষিত হয়ে উঠেছে। সে ক'দিন ধরে শুধু জপ করেছে লিলির নাম। লিলিকে স্পর্শ ক'রে যেন সে ফিরে পেয়েছে তার সমস্ত মনুষ্য-চেতনা। মানুষের স্পর্শে বুঝি জাদু আছে, তার দৃষ্টিতে বুঝি সঞ্জীবনী মন্ত্র আছে! তাই অরণ্যের শিশু, যে এতদিন ধরে শুধু জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে মানুষ হয়েছে, তার আজ আর ভাল লাগল না তাদের। নতুন মানুষকে দেখে তার প্রতি জন্মাল

তার মোহ। মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তরের বুঝি কোন গোপন সংযোগ আছে। তাই চার-পাঁচ দিন লিলিকে না দেখে সুচাঙ্ ছুটে যাচ্ছিল সেই বনে।

মানুষবেশী জানোয়ারের এই অদ্ভুত সাহস ও অবিশ্বাস্য ক্ষমতা নিজের চোখে দেখে প্রফেসার হ্যামিলটন বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হয়ে গেলেন। যে এইমাত্র তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাল তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার একটা ভাষা পর্যন্ত যোগাল না তাঁর মুখে। গভীর অরণ্য। কোন দিক দিয়ে তার বেরুবার পথ নেই। সুচাঙ্ বুঝতে পারলে হ্যামিলটনের এই নিরুপায় অবস্থা। তাই হাতছানি দিয়ে ইশারায় তাঁকে ডেকে সে এগিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে পথ দেখিয়ে চলতে লাগল। যন্ত্র-চালিতের মত প্রফেসার হ্যামিলটন শুধু তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন এবং বহুক্ষণ পরে তাঁবুর কাছাকাছি গিয়ে পিছন ফিরতেই দেখলেন সেই অদ্ভুত জানোয়ারটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

টলতে টলতে এসে প্রফেসার হ্যামিলটন তাঁবুতে পৌঁছলেন; কিন্তু তখনো পর্যন্ত তাঁর সঙ্গীরা কেউ ফিরে আসেনি দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

লিলি ছুটে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, বাবা কোথায়? কেন তাঁর আসতে এত দেরি হচ্ছে? তার মুখে-চোখে একটা আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠলো। প্রতিদিন তার বাবা প্রফেসারের সঙ্গে একত্র ফিরে আসেন।

মিঃ হ্যামিলটন তখন যা যা হয়েছিল সব লিলিকে বললেন।

সেই কথা শুনে লিলির মুখ শুকিয়ে গেল এবং যতক্ষণ না তার বাবা ফিরে আসে ততক্ষণ তাঁবুর মধ্যে না গিয়ে বসে রইল সেই বনের দিকে চেয়ে।

সুচাঙ্ একটা গাছের মাথায় বসে লুকিয়ে লিলিকে দেখছিল।

এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা করতে করতে বেলা দুটো বাজলো। তখনো লিলির বাবা বা অন্য কোন শিকারীরা ফিরে এলেন না দেখে প্রফেসার হ্যামিলটন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনিও তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে লিলির কাছে বসে রইলেন। মধু, লিলি, প্রফেসার ও অন্যান্য শিকারী, জন-মজুর যারা যারা বাসায় ছিল সবাই তাদের পথ চেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে রইল।

প্রফেসার হ্যামিলটন আবার সেজেগুজে বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হলেন তাদের সন্ধানে যাবেন ব'লে। লিলি আবদার ধরলে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য। এমন সময় দেখা গেল ক্যাপ্টেন চৌধুরী খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছেন এবং তার পিছনে মাত্র তিনজন লোক—দু'জন মজুর ও একজন শিকারী, আর তাদের কাঁধে নিকলসনের মৃতদেহ। তাদের সকলের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত।

তাদের দেখেই সকলে বুঝতে পারলে ব্যাপার কি। ক্যাপ্টেন চৌধুরী তখন বললেন, আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বোধ হয় তারা সকলেই মারা গেছেন। চারিদিকে সিংহের গুহা, তার মধ্যে আমরা গিয়ে পড়েছিলুম। পনেরো-বিশটা ক্ষুধিত সিংহ আমাদের আক্রমণ করেছিল চারধার থেকে। সিংহ-গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বনভূমি প্রকম্পিত হয়ে উঠলো এবং আমরা চোখের সামনে দেখলুম রিচার্ডসন, রবার্টসন ও অন্য শিকারীদের মৃতদেহ মুখে ক'রে নিয়ে চলে গেল সিংহেরা

তাদের গহ্বরে।

ক্যাপ্টেন চৌধুরীর মুখ থেকে সঙ্গীদের মরণের এই নৃশংস কাহিনী শুনে তাঁরা সকলে নির্বাক হয়ে গেলেন। কারো মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। সকলের চোখ ছল ছল করতে লাগল। প্রফেসার হ্যামিলটনের চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। লিলি শাড়ীর আঁচল দিয়ে বার বার চোখ মুছতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে প্রফেসার কথা কইলেন। তিনি বললেন, ক্যাপ্টেন চৌধুরী, আর না, চলুন কালই আমরা দেশে ফিরে যাই।

তাই স্থির হ'লো। তারপর খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে তাঁরা সকলে নিকল্‌সনের মৃতদেহটা একটা গাছের গোড়ায় নিয়ে গিয়ে গোর দিলেন এবং তার ওপর কাঠ দিয়ে একটা 'ক্রশ' তৈরী ক'রে দিলেন।

তখন সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই। লোকজনরা সবাই মিলে জিনিসপত্তর বাঁধাছাঁদা করতে ব্যস্ত। ক্যাপ্টেন চৌধুরী প্রফেসার হ্যামিলটন ও অন্যান্য শিকারীরা সবাই বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। লিলি এক ফাঁকে একটা পাতায় ক'রে কতকগুলো ফুল নিয়ে গিয়ে সেই কবরের ওপর রাখলে, তারপর যেমন উঠে দাঁড়িয়েছে অমনি সুচাঙ্‌ পিছন দিকে থেকে এসে লিলিকে বুকে তুলে নিয়ে গাছের ডালে ডালে লাফাতে লাফাতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাবা বাবা ক'রে লিলি চীৎকার করতে লাগল। তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সেই অরণ্যের গাছপালার মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেল, ক্যাপ্টেন চৌধুরী বা অন্য কারুর কানে এসে পৌছল না।

কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন চৌধুরীর হুঁশ হ'লো। তিনি মধুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, লিলি কোথায়? মধু বললে, আছে এইখানেই।

চঞ্চল মেয়েটি সর্বদা একটা না একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিছুক্ষণ এধার ওধার খুঁজে লিলিকে দেখতে না পেয়ে মধু তখন তার নাম ধরে ডাকতে লাগল। অরণ্যের গাছপালার মধ্যে সেই ডাক প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে মিলিয়ে গেল।

কোথায় গেল? মধু এইবার রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। বনের মধ্যে তখন আর ভাল ক'রে দৃষ্টি চলে না। অন্ধকার রাক্ষসী চুপি চুপি কালো চাদর মুড়ি দিয়ে এসে যেন হঠাৎ সেই অরণ্যের মুখ চেপে ধরেছে, সে চীৎকার করতে পারছে না, শুধু ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। মধু তাড়াতাড়ি তাঁবুর মধ্যে গিয়ে বললে, বাবু সর্বনাশ হয়েছে—লিলিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

অ্যাঁ! লিলিকে পাওয়া যাচ্ছে না? ব'লে ক্যাপ্টেন চৌধুরী, প্রফেসার হ্যামিলটন ও অন্যান্য সকলে বন্দুক নিয়ে তৎক্ষণাৎ বাইরে বেরিয়ে এলেন। ঘন দুর্ভেদ্য অন্ধকারে সমস্ত বনভূমি তখন থম থম করছে। কোথায় যাবেন? কোন্ দিকে যাবেন? স্থির করতে না পেরে তাঁরা কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে প্রাণপণে লিলি লিলি ব'লে চীৎকার করতে লাগলেন এবং মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ করতে লাগলেন। কিন্তু বৃথা। তাতে কোন ফল হ'লো না। ক্যাপ্টেন চৌধুরী ও প্রফেসার হ্যামিলটন

সমস্ত রাত ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন! দুশ্চিন্তায় তাদের মুখ শুকিয়ে গেল। কাল চলে যাবেন, সব ঠিক, এমন সময় এ কি দুর্ঘটনা! ভোরের আলো দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দু'চারজন লোক নিয়ে তাঁরা দু'জনে বেরিয়ে পড়লেন। এ-বন ও-বন ক'রে কত ঘুরলেন, কত চীৎকার করলেন, কিন্তু লিলির কোন সন্ধান করতে পারলেন না। শেষে না খেয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যার সময় সকলে তাঁবুতে ফিরে এলেন।

তখনকার মত যাওয়া তাঁদের স্থগিত রইল। লিলির অনুসন্ধান না করা পর্যন্ত ক্যাপ্টেন চৌধুরী কিছুতেই সে স্থান ত্যাগ করতে রাজী হ'লেন না। নিশ্চয় কোন দুর্বৃত্ত তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, এই তাঁর মনের বিশ্বাস। লিলি মরেনি; তাহ'লে কোথাও না কোথাও তার মৃতদেহের রক্ত বা ছিন্ন বস্ত্রাংশ নিশ্চয়ই পাওয়া যেতো—তাই প্রত্যহ লোকজন নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি তার অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এইভাবে দশ দিন, পনের দিন গেল এবং দেখতে দেখতে পুরো এক মাস কাটলো। তবুও লিলির কোন সন্ধান মিললো না।

কন্যার শোকে ক্যাপ্টেন চৌধুরী পাগলের মত হয়ে গেলেন এবং এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একদিন প্রায় অপরাহ্ণবেলায় তিনি এসে পড়লেন সেই বেদে জঙ্গলীদের আড্ডায়। সঙ্গে তার শুধু মধু চাকর ও প্রফেসার হ্যামিলটন। অন্যান্য লোকজন আর একটা পৃথক দল ক'রে অন্যদিকে গেছে। এই বীভৎস-দর্শন তীর-ধনুক-ধারী উলঙ্গদের দল দেখে তাঁদের মনে একটু ভয় হ'লো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন চৌধুরীর মনে হ'লো, নিশ্চয়ই এরা ধরে এনেছে লিলিকে—এখানে হয়ত লিলির সন্ধান মিলতে পারে। তিনি মিঃ হ্যামিলটনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কতগুলো বন্দুকের গুলি আছে আপনার কাছে?

হ্যামিলটন উত্তর দিলেন, প্রায় একশো।

ক্যাপ্টেন চৌধুরীও তাঁর থলিতে হাত পুরে দেখলেন, তাঁর কাছেও আছে গোটা পঞ্চাশ। গুলি মেরে মেরে আরো কিছুদূর তাঁরা এগিয়ে গেলেন, তারপর বন্দুক দিয়ে দু'জনে দুটো জঙ্গলীকে দ্যুম্ দ্যুম্ ক'রে আঘাত করলেন। তারা মরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা ভীষণ রব উঠলো। দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে অসভ্য জঙ্গলীরা এসে তাঁদের ঘিরে ফেললে। তাদের সকলের হাতে তীরধনুক ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র। তখন আর পালাবার কোন উপায় নেই দেখে অগত্যা তাদের হাতেই তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন। তারা আগে তাঁদের কাছ থেকে বন্দুকগুলো কেড়ে নিলে, তারপর একে একে তিনজনকে বেশ ক'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেল তাদের আড্ডায় এবং একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে পুরে রাখলে।

রাত্তির হ'লো। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও দুশ্চিন্তায় তাদের কারো চোখে একফোঁটা ঘুম এলো না। ক্যাপ্টেন চৌধুরী দেখলেন চারিদিকে রাক্ষসের মত অসভ্য লোকগুলো অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছে—পালাবার কোন উপায় নেই। মৃত্যুর আসন্ন চিন্তা ফুটে উঠলো তিনজনের মুখেচোখে।

পরদিন সমস্ত সকাল ও দুপুর তাঁরা সেই ঘরে বন্ধ রইলেন। বিকেল নাগাদ হৈ হৈ করতে করতে একদল জঙ্গলী এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলো এবং তাঁদের টানতে টানতে নিয়ে গেল উঠানে, তারপর

সেখানে তাদের শুইয়ে ফেলে লম্বা লম্বা বাঁশের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে, সেই বাঁশ তিনটে পুঁতে ফেললে মাটিতে। তাঁরা তিনজন মড়ার মত হয়ে ঝুলতে লাগলেন বাঁশের উপর। তারপর এলো শুকনো কাঠ, লতাপাতা। বাঁশ তিনটের নীচে জঙ্গলীরা সেগুলো রাখলে। তারপর সকলে মিলে গোল হয়ে নাচতে নাচতে, গান করতে করতে, সেই কাঠে আগুন জ্বালিয়ে দিলে। একটু একটু ক'রে ধূমায়িত হ'তে হ'তে সহস্র শিখায় আগুন জ্বলে উঠলো এবং তারি ঝাঁজে ঝলসে যেতে লাগল তাঁদের দেহ।

এমন সময় হঠাৎ একটা গাছের ওপর থেকে চীৎকার ক'রে উঠলো সুচাঙ্। এ সেই ডাক! সেই বিপদের সঙ্কেতধ্বনি! সমস্ত অরণ্য কেঁপে উঠলো সেই ডাক শুনে। জঙ্গলীরা চমকে উঠে চেয়ে দেখলে তাদের সামনে সুচাঙ্—বনের দেবতা!

তখনি তারা সব ফেলে রেখে ছুটলে যে যেদিকে পারলো। সুচাঙ্ লিলিকে পিঠে ক'রে ঝপাৎ ক'রে লাফিয়ে পড়লো একটা গাছের ওপর থেকে এবং আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সেই বাঁশগুলোকে টেনে ভেঙে চুরমার ক'রে ফেললে; তারপর ছুরি দিয়ে একে একে কেটে দিলে তাঁদের বাঁধন। তাঁরা তখন প্রায় মড়ার মত হয়ে পড়েছিলেন। সুচাঙ্ ছুটে গিয়ে জল এনে তাঁদের মুখেচোখে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে একে একে তাঁরা তিনজনেই সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

চোখের সামনে লিলিকে দেখে তাঁদের সকলের দেহে আবার নতুন প্রাণ, নতুন বলের সঞ্চার হ'লো। ক্যাপ্টেন চৌধুরী আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে কন্যাকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন, মা, তুই আজ আমাদের সকলকে বাঁচালি। লিলি বললে, বাবা আমি বাঁচাইনি, বাঁচিয়েছে এই অর্ধমানুষ ও অর্ধপশু অসভ্য জানোয়ারটি, একেই ধন্যবাদ দিন। ক্যাপ্টেন চৌধুরী, প্রফেসার হ্যামিলটন ও মধু চাকর একে একে সুচাঙ্কে বুকে জড়িয়ে ধরলে। সুচাঙ্ হাসতে হাসতে এক রকম অদ্ভুত স্বরে বললে, বাবা-বাবা-বাবা।

লিলি তখন এক-একজনকে দেখিয়ে এক-একজনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে, এই আমার বাবা, এই আমার মধুদাদা, আর এই প্রফেসার হ্যামিলটন।

সুচাঙ্ও লিলির সঙ্গে আবৃত্তি করতে লাগল, এই আমার বাবা—এই আমার মধুদাদা—এই আমার—ব'লে সে থেমে গেল—আর উচ্চারণ করতে পারলে না। তখন আবার লিলি বললে, প্রফেসার হ্যামিলটন!

সুচাঙ উচ্চারণ করলে, প্রফেসার হ্যামিলটন।

অদ্ভুত লিলির শিক্ষা। এই এক মাসের মধ্যে সে তাকে পাখীর মত পড়িয়ে পড়িয়ে শিখিয়েছে কথা বলতে, শিখিয়েছে ভাষা।

তখন ক্যাপ্টেন চৌধুরী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কোথায় ছিলি এবং কেমন ক'রে এখানে এলি মা?

লিলি বললে, সুচাঙ্ আমায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আমি তার কাছেই এই জঙ্গলের মধ্যে ছিলুম। তারপর পথ চলতে চলতে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা হয়েছিল সব কথা একে একে সে

বললে তাঁদের। লিলি যা বললে তার মর্মার্থ সংক্ষেপে হ'লো এই—

লিলিকে সুচাঙ্ ধরে নিয়ে গিয়ে একেবারে তার বাসায়—গাছের ওপর তুলেছিল। কয়েকটা গাছের ডাল যেখানে একত্র মিশেছে তার ওপর লতাপাতা, শুকনো ঘাস বিছিয়ে বিছানা তৈরী ক'রে শুয়ে থাকত সুচাঙ্। লিলিকে নিয়ে গিয়ে সে তার ওপর শুইয়ে দিলে।

বিজন বন। অন্ধকার শাঁ শাঁ করছে। কোথাও কোন পশুপক্ষীর সাড়াশব্দটি পর্যন্ত নেই। সেই গাছের মগডালে বসে ভয়ে লিলি কাঁদতে লাগল। তার কান্না শুনে অতি কদাকার কয়েকটা বন-মানুষ ছুটে এলো তার কাছে এবং কিচিরমিচির ক'রে তাদের ভাষায় তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। সুচাঙ্ ছুটে গিয়ে কোথা থেকে কতকগুলি পাকা আপেল, নেসপাতি পেড়ে এনে দিলে লিলির হাতে।

ভয়ে লিলির ক্ষিদে-তেষ্টা তখন লোপ পেয়েছে। সে শুধু কাঁদতে লাগল। সারা রাত ধরে তার সে কান্না থামল না।

সুচাঙ্ শুধু একটা কথা জানতো, লিলি। তাই সেও সারা রাত জেগে লিলি লিলি ব'লে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

তারপর সকাল হ'লো। কত ভাল ভাল ফল ফুল এনে দিয়ে সুচাঙ্ লিলির মন ভোলাতে লাগলো। এক দিন, দু দিন, তিন দিন ক'রে প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল। তখন লিলি দেখলে আর কান্না বৃথা। হয়ত তার বাপ ও সঙ্গীরা তাকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছেন কিংবা মরেছেন সেই ভীষণ বনে। এখন সুচাঙের অনুগ্রহের ওপরই বেঁচে থাকতে হবে। সুচাঙের গায়ে দৈত্যের মত বল, সমস্ত অরণ্যের সে রাজা। তাই অগত্যা সে সুচাঙের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে। সুচাঙ্ লিলিকে এমন পেয়ে বসলো যে, সে যেখানে যায় লিলিকে সেইখানে নিয়ে যায়, কাঁধে ক'রে কোলে ক'রে পিঠে ক'রে। তার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত সে বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

লিলির মনে দ্বিগুণ সাহস বেড়ে গেল, সুচাঙ্ তার সাথী, আর সে কাকে ভয় করে? সুচাঙ্ আস্তে আস্তে তার কায়দাকানুন সব শেখাতে লাগল লিলিকে। আর লিলি তাকে কথা শেখাতে লাগল, বুঝিয়ে দিতে লাগল কোন্ জিনিসটাকে কি বলে। লিলি সাঁতার শিখলে, তীর-ধনুক ছুঁড়তে শিখলে, গাছ বাইতে শিখলে, হাতীর পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল বনে বনে।

এইভাবে প্রতিদিন এই বন থেকে অন্য বনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তারা সেদিন এসে পড়লো সেই বনটার কাছে। দূর থেকে ধোঁয়া দেখে এবং জঙ্গলীদের মিলিত-কণ্ঠের অদ্ভুত সঙ্গীত শুনে লিলির মনে কেমন আতঙ্ক হ'লো। সে সুচাঙ্‌কে জড়িয়ে ধরে ভয়ার্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি?

সুচাঙ্ অবশ্য জানতো যে সেখানে জঙ্গলীদের ভোজ ও নৃত্য-গীত চলেছে, কিন্তু তবুও একসঙ্গে এত ধোঁয়া উঠতে দেখে তারও কেমন সন্দেহ হ'লো। সে লিলিকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা উঁচু গাছের ওপর গেল—সেখান থেকে সেই অদ্ভুত জীবগুলিকে তাকে দেখাবার জন্য এবং নিজের কৌতূহল নিবৃত্তি করবার জন্যও বটে।

যেই তারা গাছের ওপর উঠেছে, অমনি বাঁশের সঙ্গে ঝোলানো তিনটি মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে

দেখেই লিলি চিনতে পারল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে শিউরে উঠল। তারপর সুচাঙ্‌কে দেখিয়ে বললে, আমার বাবাকে ওরা মেরে ফেলছে, শিগ্‌গির চলো।

লিলির দলের লোকদের সুচাঙ্‌ আগেই দেখেছিল এবং চিনতো; কাজেই আর কালবিলম্ব না ক'রে সে আর একবার তার সেই ভয়াবহ হুঙ্কার ছাড়লে; তারপর একেবারেই লাফিয়ে পড়লো জঙ্গলীদের মাঝখানে। জঙ্গলীরা সুচাঙ্‌কে মনে করতো বনের দেবতা। তাই দেবতা ক্রুদ্ধ হয়েছেন ভেবে তারা যে যেদিকে পারলে ছুটে পালালো। তারপর সুচাঙ্‌ আগুনের মধ্যে লাফিয়ে প'ড়ে রক্ষা করলে তাঁদের।

লিলির মুখ থেকে নিজেদের সেই উদ্ধারের কাহিনী শুনে ক্যাপ্টেন চৌধুরী ও প্রফেসার হ্যামিলটন বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং সুচাঙের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁদের মাথা নত হয়ে গেল। তাঁরা ভাবতে লাগলেন দৈবক্রমে যদি লিলি ও সুচাঙ্‌ সেখানে এসে না পড়তো তাহ'লে এতক্ষণ হয়ত তাঁদের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়ে মিশে যেতো মাটির সঙ্গে।

লিলি তখন তার বাবার কাছে শুনতে চাইলে কেমন ক'রে তাঁরা সেই জঙ্গলী রাক্ষসদের হাতে এসে পড়লেন।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী কন্যাকে হারানোর দিন থেকে সেই দিন পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা বলতে বলতে পথ চলতে লাগলেন।

সুচাঙ্‌ সেই গভীর জঙ্গল ভেদ ক'রে তাঁদের পথ দেখাতে দেখাতে অতি দ্রুত, সংক্ষিপ্ত পথে তাঁদের তাঁবুতে নিয়ে এলো। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন সবে নামছে অরণ্যের অন্তরে, বৃক্ষলতার ছায়াময় কুঞ্জে, তখন তাঁরা সকলে এসে পৌঁছলেন তাঁবুতে।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী ও প্রফেসর হ্যামিলটন অত্যন্ত খুশী হলেন যখন দেখলেন তাঁরা আসবার আগেই তাঁদের সঙ্গীরা অক্ষত দেহে তাঁবুতে ফিরে এসেছে।

তারপর রাত্রিতে সবাই খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়লেন তাঁবুতে। সুচাঙ্‌ও তাঁদের সঙ্গে এক তাঁবুর মধ্যে নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমালো।

পরদিন ভোরে উঠেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল। জিনিসপত্তর সব বাঁধাছাঁদা হ'তে লাগল। লিলি সুচাঙ্‌কে বেশ ভাল ক'রে স্নান করিয়ে দিলে; তার গা-হাত-পা রগড়ে সাফ ক'রে দিলে; তারপর তার গলা থেকে সেই হাড়ের মালা খুলে ফেলে দিলে। তার হাতে যে মাদুলিটা ছিল সেটা কালো হয়ে গিয়েছিল, সেটাকেও খুলে ফেলবার জন্য লিলি টানাটানি করতে লাগল। কিন্তু সেটা এত শক্ত হয়ে হাতের মধ্যে বসে গিয়েছিল যে সে একলা কিছুতেই সেটা খুলতে পারলে না। তখন লিলি তার বাবাকে ডাকলে ছুরি দিয়ে কেটে দেবার জন্য।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী এসে ছুরি দিয়ে সেটা কেটে ফেললেন। সুচাঙের হাতে একটা গভীর কালো দাগ প'ড়ে গিয়েছিল সেই দড়িটার। ক্যাপ্টেন চৌধুরী সেই দড়িটাকে আলোতে ধরে দেখলেন সেটা মোটা তাঁত। আর সেই কালো মাদুলিটার একটা জায়গায় যেন কী লেখা রয়েছে ব'লে তাঁর মনে হ'লো।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাদুলিটা মাটি দিয়ে ঘষে মেজে সাফ ক'রে ফেললেন এবং দেখে অবাক হয়ে গেলেন যে তাতে লেখা রয়েছে তাঁর নাম, ধাম, বিবরণ সমস্ত।

ক্যাপ্টেন চৌধুরীর সঙ্গে রাজা ইন্দ্রনারায়ণের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বহুবার তাঁর সঙ্গে একত্রে শিকারে গিয়াছেন, বহুবার বহু ভোজ খেয়েছেন তাঁর বাড়ীতে। তিনি রাজা ইন্দ্রনারায়ণের শিশুপুত্র ও স্ত্রীর মৃত্যুর কথা শুনেছিলেন এবং নিজেও অনেক খোঁজ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে একদিন হঠাৎ ঝড়-জলের মধ্যে প'ড়ে নৌকাডুবি হয়ে তাদের মৃত্যু হয়।

চকিতে সমস্ত জিনিসটা তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠলো। তিনি প্রফেসার হ্যামিলটন ও লিলিকে ডেকে সেই মাদুলির লেখাটা দেখালেন এবং তাঁর ও তাঁর মায়ের মৃত্যুর কথা একে একে তাঁদের কাছে বললেন।

তাঁরা সকলে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, কেমন ক'রে একজন মানুষ শুধু পশুদের সংসর্গে থেকে পশু হয়ে যায় এবং মানুষের সংস্পর্শে এসে আবার মানুষ হয়ে ওঠে। এই দুনিয়ার নিয়ম। ভালর সঙ্গে থাকলে ভাল হয়—মন্দের সঙ্গে থাকলে মন্দ হয়। সর্বত্র এই প্রথা চলেছে।

তারপর লিলি তার পুরোনো বাঘের চামড়ার লেংটিটা খুলিয়ে ফেললে এবং ক্যাপ্টেন চৌধুরীর একটা কাপড় ও জামা তাকে পরিয়ে চিরুনি দিয়ে তার মাথার চুলগুলো টেনে টেনে জট ছাড়িয়ে দিলে। বনের পশু সুচাঙ্‌, মানুষ হয়ে উঠলো মানুষের পোশাক প'রে। এইবার তাঁরা সকলে ফিরলেন দেশে।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ জানতেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্র নৌকোডুবি হয়ে মারা গিয়েছে এবং তার সঙ্গে আরো অনেক মাঝিমাল্লাও মরেছে। অন্যান্য দাঁড়ি-মাঝি যারা সেই ঝড়ের মধ্যে প'ড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে তাঁকে সেই রকম সংবাদই দিয়েছিল। বাধ্য হয়ে তিনি তাদের কথাতেই বিশ্বাস করেছিলেন, তবু নিজেও একবার লোকজন নিয়ে চারদিকে খুঁজেছিলেন। দেশে দেশে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যে তাদের কোন সংবাদ দিতে পারবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেবেন। তারপর এইভাবে যখন একদিন, দুদিন ক'রে দু'বছর কেটে গেল, তখন তাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত ব'লে স্থির করলেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর মনে আর কোন দ্বিধা রইল না।

তিনি অনেক শোক করলেন এবং আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও আর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করলেন না। স্ত্রীপুত্র হারিয়ে তাঁর অন্তরে এমন নিদারুণ আঘাত লেগেছিল যে, তিনি নিরুৎসাহ ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়লেন। নিজে আর জমিদারির কাজকর্ম্ম দেখতেন না। দিনরাত যেন এক দুঃসহ বেদনা তিনি অন্তরের মধ্যে বহন করতেন। তাঁর জীবনের সকল আনন্দ-প্রদীপ যেন একসঙ্গে নিভে গেল। এইভাবে সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কেটে গেছে। বৃদ্ধ, অকর্মণ্য, শয্যাশায়ী হয়ে যখন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তিনি দিন গুনছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন সদলবলে ক্যাপ্টেন চৌধুরী, লিলি, প্রফেসার হ্যামিলটন ও অন্যান্য শিকারীরা সুচাঙকে নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন তাঁর বাড়ীতে। তারপর তাঁরা একে একে সমস্ত কথা তাঁকে বললেন এবং সেই মাদুলিটা দেখালেন।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন। বহুদিন পরে আবার যেন তিনি অন্তরে যৌবনের তেজ ও সাহস অনুভব করতে লাগলেন। তিনি সুচাঙ্‌কে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি ক্যাপ্টেন চৌধুরী, প্রফেসার হ্যামিলটন, লিলি, অন্যান্য লোকজন যারা তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিল প্রত্যেককে বুকে টেনে নিয়ে অজস্র আশীর্বাদ করলেন এবং সঙ্গের লোকদের প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিলেন।

আবার রাজাপ্রাসাদের ঘরে ঘরে বহুদিন পরে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠলো। আবার আনন্দ কোলাহলে মুখর হয়ে উঠলো সমস্ত রাজপুরী।

গল্প

লুকোচুরি

রাজার চোখে ঘুম নেই। তাঁর রাজ্যে এত ঐশ্বর্য, তবু লোকের দারিদ্র্য ঘোচে না কেন ? নিত্য অভাব—অভাবের পর অভাব বেড়েই চলে। ক্ষেত-ভরা ধান, অথচ না খেয়ে লোক মরে, ঘরে ঘরে চরকা তাঁত, কিন্তু কারো পরনে ভালো কাপড় নেই, নদী-পুষ্করিণীতে জল ধরে না, অথচ সে-জল রোগের বীজাণুতে বিষাক্ত !

কি হবে ? ভেবে ভেবে রাজা রোগা হয়ে যান। চিন্তার শেষ নেই তাঁর। মন্ত্রীকে ডাকেন, কোটালকে ডাকেন, ডাকেন সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ, পাত্র-মিত্র, অমাত্যবর্গ রাজ্যের যে যেখানে আছে সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের, বলেন, এর একটা উপায় আজই করতে হবে। আমার রাজ্যে একটি প্রজাও যেন কষ্টে না থাকে।

মন্ত্রী মন্ত্রণাকক্ষে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আলোচনা শুরু ক'রে দেন উচ্চপদস্থদের সঙ্গে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। রাজা অধৈর্য হয়ে ওঠেন। শেষে মন্ত্রী এসে রাজামশায়কে বলেন, উচ্চ কর্মচারীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। যেখানে একজন আছে সেখানে তুজন করতে হবে, তাহলে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

তথাস্তু।···রাজা হুকুম দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেল। তাদের জন্যে নতুন নতুন ঘর তৈরী হলো, তাদের থাকা, খাওয়া ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হতেও দেরি হলো না। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই রাজামশায় আবার ডাকলেন মন্ত্রীকে, বললেন, কই, এতে তো কোন সুবিধে হলো না, উল্টে লোকের তুঃখ যেন আরো বাড়ছে !

তখন মন্ত্রী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, আমার মনে হয়, এই কর্মচারীরা যাতে কাজে ফাঁকি না দেয় তা পরীক্ষা করার জন্যে একদল বিশ্বাসী লোক রাখতে হবে।

রাজামশায় বললেন, তথাস্তু।

তুজনের কাজ পরীক্ষা করার জন্যে আরো তু'জন ক'রে বিশ্বাসী লোক তখন নিযুক্ত হলো। কিন্তু এতেও সুবিধে হলো না। আবার রাজা মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

মন্ত্রী এলে রাজা বললেন, কই, তুঃখকষ্ট তো আগের চেয়ে বেড়েই যাচ্ছে, কি-রকম ব্যবস্থা করলেন ?

মন্ত্রী মুশকিলে পড়লেন। কথাটা যে সত্যি, তা তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। অথচ কিই-বা করবেন? কেবলি মাথা ঘামান। তিনি দু'দিন সময় চাইলেন রাজামশায়ের কাছ থেকে।

রাজামশায় বললেন, বেশ, কিন্তু এবারে যা করবেন তাতে যেন কোন গলদ না থাকে—সব দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যায় যেন।

মন্ত্রীমশায় অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে রাজামশায়কে বললেন, আমার মনে হয়, এই যে দু'জন ক'রে লোক নিযুক্ত হয়েছে, এরা ঠিকভাবে এদের কর্তব্যকর্ম করছে কিনা দেখবার জন্যে এদের ওপর আরো দুজন ক'রে পরীক্ষক নিযুক্ত করতে হবে।

রাজামশায় বললেন, তাই হোক।

তা হ'তে বেশী দেরি হলো না বটে, কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, ততই যেন প্রজাদের দারিদ্র্য উৎকট হয়ে উঠলো।

এবার রাজামশায় অত্যন্ত রেগে গেলেন মন্ত্রীর ওপর। তাঁকে ডেকে ধমক দিয়ে বললেন, এ কি রকম অব্যবস্থা আপনার! যদি না পারেন তো স্পষ্ট ক'রে বলুন, আমি অন্য লোক দেখি।

মন্ত্রীমশায়ের মুখ চাকরি যাবার ভয়ে শুকিয়ে উঠলো। তিনি জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে বললেন, রাজামশায় যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি।

বলুন, আপনাকে তো আমি সর্বদাই অভয় দিয়ে এসেছি—তবে এত সঙ্কোচ প্রকাশ করছেন কেন? বলুন, কি বলতে চান? ব'লে রাজামশায় জিজ্ঞাসু-নেত্রে মন্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

মন্ত্রী তখন দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, আপনার রাজ্যে প্রজার সংখ্যা যেমন রোজ বাড়ছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কাজও বেড়ে চলেছে। কাজেই আরো কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ানো দরকার এবং তারা আবার কাজ ঠিক করছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যেও যত কর্মচারী তত পরীক্ষক দরকার।



মন্ত্রীমহাশয়ের মুখ চাকরি যাবার ভয়ে শুকিয়ে উঠলো

রাজা বললেন, যা দরকার মনে করেন করুন—আমি তো আপনাকে অবাধ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছি। তবে এই শেষ—আমি এক বছর সময় দিলুম, এর মধ্যে যদি প্রজাদের দুঃখকষ্ট না কমে তাহ'লে আপনার চাকরি যাবে!

এক বছর অনেক সময়। মন্ত্রী উৎফুল্ল মুখে চলে গেলেন।

কিন্তু যত দিন যায়, মন্ত্রীর মুখ তত শুকিয়ে ওঠে। একজনের জায়গায় দুজন, দুজনের জায়গায় চারজন, চারজনের জায়গায় আটজন, ষোলজন—এইরকম ক'রে লোকের পর লোক বাড়িয়েও কিছু ফল হয় না। দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, মহামারীতে রাজ্য ভরে উঠলো। কঙ্কালসার প্রজারা মিছিল ক'রে রাজার দোরে এসে চাইলে খাবার।

এক বছর পূর্ণ হতে তখনো এক মাস দেরি। রাজা অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি তখন ভাণ্ডারীকে ডেকে বললেন, তোমার ভাঁড়ারে যা আছে সব নিয়ে এদের খেতে দাও—ওদের মুখের দিকে আমি চাইতে পাচ্ছি না।

ভাণ্ডারী বললে, রাজামশায়, ভাঁড়ার যে শূন্য! ওদের দেবার মত কিছু তো নেই!

তোমার ভাঁড়ার শূন্য! সে কি?

ভাণ্ডারী বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। মন্ত্রীমশায় যে-সব কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন, তাদের খাওয়াতে খাওয়াতেই সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

রাজামশায় চীৎকার ক'রে বললেন, তা ব'লে আমার প্রজারা আমার দোরে এসে না খেয়ে ফিরে যাবে? তা হবে না। ডাকো কোষাধ্যক্ষকে।

কোষাধ্যক্ষ এসে দাঁড়াতেই রাজামশায় বললেন, শীগ্‌গির একশো মোহর ভাঁড়ারীকে দাও—ও কিছু মিষ্টান্ন এনে প্রজাদের খাইয়ে দিক।

কোষাধ্যক্ষ বললে, মহারাজ, আমার কোষাগার শূন্য। যা ছিল সব মন্ত্রীমশায়ের নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন দিতে-দিতেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

অ্যাঁ! এত টাকা সব শেষ হয়ে গেল! রাজার যেন বিশ্বাসই হয় না। তিনি তখন নিজের দেহাবরণ থেকে বহুমূল্য অলঙ্কার খুলে ভাণ্ডারীর হাতে দিলেন। বললেন, এটা বিক্রি ক'রে এর অর্থ দিয়ে খাদ্য এনে এদের খাইয়ে দাও।

তারা বিদায় হতে রাজামশায়ের চিন্তা বেড়ে গেল। তাঁর রাজকোষ শূন্য! তাঁর ভাণ্ডার শূন্য! এ কি সম্ভব?

তিনি তখনি কোটালকে ডেকে বললেন, আমার রাজ্যে কি চোর ঢুকেছে?

কোটাল একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললে, আমাকে এক মাস সময় দিন, আমি কর্মচারীদের কাছ থেকে সঠিক বিবরণ জেনে নিয়ে আপনাকে জানাবো।

রাজামশাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, সে কি! এখন জানাতে পারবেন না?

কোটাল বিনীতস্বরে বললে, আজ্ঞে, এখন তো আর আগের দিন নেই, আমার নীচের নীচের করতে করতে একেবারে নিম্নতম কর্মচারীর কাছে এই সংবাদ গিয়ে পৌঁছুতে লাগবে পনেরো দিন, আবার তেমনিভাবে খবরটা ওপরে ওপরে উঠে আসতে আসতে আরো পনেরে দিন। কাজেই পনেরো আর পনেরোয় তিরিশ—এক মাসের আগে কি ক'রে সম্ভব?

রাজা মুখে বললেন তাই হবে, কিন্তু মহা সমস্যায় পড়লেন। প্রতিদিন প্রজাদের দুঃখকষ্টের

কাহিনী আসে তাঁর কানে, অথচ কি করবেন ভেবে পান না।

অনেক ভেবে, কোন সমাধান করতে না পেরে, শেষে হিমালয়ের বুকে এক নির্জন গহ্বরে তপস্যায় রত তাঁর গুরুর কাছে ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি তখনি রওনা হয়ে গেলেন।

গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর ছেড়ে তিনি যখন হিমালয়ের পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন দেখলেন এক জায়গায় অনেকগুলি ছোট ছেলে লুকোচুরি খেলা করছে। একজনের চোখ বাঁধা, কিন্তু সে একে একে সকলকে খুঁজে বার করছে।

রাজা থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হলো, এই ছেলেটাকে যদি নিয়ে যাই, তাহ'লে তাঁর সন্দেহ কত দূর সত্য তা সে হয়তো ব'লে দিতে পারবে এক মাসের অনেক আগেই। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ! যে ছেলেটার চোখ বাঁধা ছিল, তার মা-বাপের কাছে গিয়ে ব'লে তখনি তিনি ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যে ফিরলেন, আর তাকে কি করতে হবে তাও চুপি চুপি ব'লে দিলেন।

একদিন, ছদিন, তিনদিন কেটে যাবার পর ছেলেটা রাজামশায়কে এসে বললে, এত বড় রাজ্যে চোর ধরা একার দ্বারা সম্ভব নয়। আমাদের দল চাই।

রাজা বললেন, বেশ, তোমার দলকে তাহ'লে নিয়ে এসো।

ছেলেটা গিয়ে তখনি দেশ থেকে তার একশো খেলার সঙ্গীকে নিয়ে এলো।

* * * *

এবার শুরু হলো চোর-চোর খেলা। ছেলেদের সঙ্গে বুড়োদের। বুড়োরা যা কিছু লুকোতে যায়, ছাখে, ছেলেরা ঠিক আছে আনাচে-কানাচে।

ছেলেদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে কর্মচারীরা। তারা এসে অভিযোগ জানায় রাজামশায়ের কাছে, বলে, এরা তাদের কাজে কেবল বাধা দেয়, এদের না তাড়ালে তারা কাজে মনোযোগ দিতে পারছে না।

রাজা আবার পড়লেন চিন্তায়। তিনি তখনি ছেলেদের পাণ্ডাকে ডেকে বললেন, তোমরা কারুর কাজে বাধা দিয়ো না।

ছেলেদের পাণ্ডা বললে, মহারাজ, চোখের সামনে যদি দেখি চুরি করতে, ঘুষ নিতে, তাহ'লেও বাধা দেবো না?

রাজা বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, চোখের সামনে দেখছো চুরি করতে, অথচ আর কেউ তা দেখতে পাচ্ছে না? বলো কি? আমি রাজ্যে এত গোয়েন্দা, এত শান্তিপাহারা পুষছি কি জন্যে তবে?

ছেলেটি বললে, যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তাহ'লে আমায় এমন ক্ষমতা দিন, যার বলে যাকে চুরি করতে দেখবো তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া লাগিয়ে বন্দীশালায় পুরে ফেলতে পারবো!

কথাটা রাজার মন্দ লাগলো না। তিনি নিজের হাতের পাঞ্জা খুলে তার হাতে দিলেন এবং তাঁর নামাঙ্কিত আরো একশো পাঞ্জা এনে দিলেন তার দলের জন্যে।

গোপনে ছেলের দল তখন লেগে গেল কাজে। একদিন, দুদিন, তিনদিন যেতে-না-যেতে বন্দী-শালার ঘর ভরে উঠতে লাগলো। তখন প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের টনক নড়লো। তারা গোপনে মিলিত হয়ে পরামর্শ করতে লাগলো, কি উপায়ে সেই ছেলেদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়!

একজন বললে, ওদের বিষ খাইয়ে মেরে ফেললেই চুকে যায়। কেউ বললে, তার চেয়ে গোপনে ওদের ঘরে কিছু টাকা লুকিয়ে রেখে, তারপর চোর ব'লে ওদের ধরিয়ে দিলেই সব চেয়ে ভালো হয়। এ-কথাটা যখন সকলেই সমর্থন করলে, তখন কোটাল বললে, অত সব করার দরকার হবে না— ওরা সত্যি সত্যি টাকা চুরি ক'রে এক জায়গায় সরিয়ে রাখে, সে-খবর আমি জেনেছি কাল রাত্রে।

সকলেই তখন উৎসুক হয়ে উঠলো খবরটা জানবার জন্যে।

কোটাল বিজ্ঞের মত বললে, আমি ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করেছি, ছেলেগুলো সব রাত্রের দিকে কুঞ্জবনের পেছনের মহলে একটা ঘরে যায় এবং অনেক রাত্তির পর্যন্ত কি করে, তারপর একটা ঘরে বড় বড় তালা দিয়ে চলে আসে। কাল পা টিপে টিপে গিয়ে আমি নিজে শুনেছি, অনেক টাকার ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ।

আর যায় কোথায়! পরের দিন তারা সকলে মিলে রাজামশায়ের কাছে গেল এবং বললে, ছেলেগুলো ভীষণ চোর! রোজ রাত্রে টাকা চুরি ক'রে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে, আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

রাজাকে নিয়ে তারা সেইদিন রাত্রে কুঞ্জবনের পেছনের সেই ঘরটায় গিয়ে হাজির হলো। ছেলেদের পাণ্ডা তখন শেষ চাবিটা লাগাচ্ছিল। পেছনে ফিরে রাজামশায়কে পাত্রমিত্র ও অমাত্য-বর্গসহ দেখে একটু বিস্মিত হলো। বললে, এত রাত্রে আপনারা এখানে কি মনে ক'রে?

মন্ত্রী বললে, হুঁহুঁ বাবা, ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পাবে না ভেবেছিলে, এখন হাতে হাতে ধরা পড়েছো চাঁদ! এইবারে খোলো ওই ঘরের তালাগুলো!

ছেলেটি তখন মন্ত্রীকে বললে, আপনার হুকুমে আমি খুলবো না।

রাজামশায় অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তিনি বললেন, আর আমি যদি হুকুম দিই?

ছেলেটি বললে, তাহ'লে নিশ্চয় খুলবো। তবে আমার একটি অনুরোধ, শুধু আপনি ছাড়া আপনার আর কোন লোকজন থাকবে না।

রাজামশায় ধমক দিয়ে উঠলেন, না, সকলের সামনেই তোমায় খুলতে হবে।

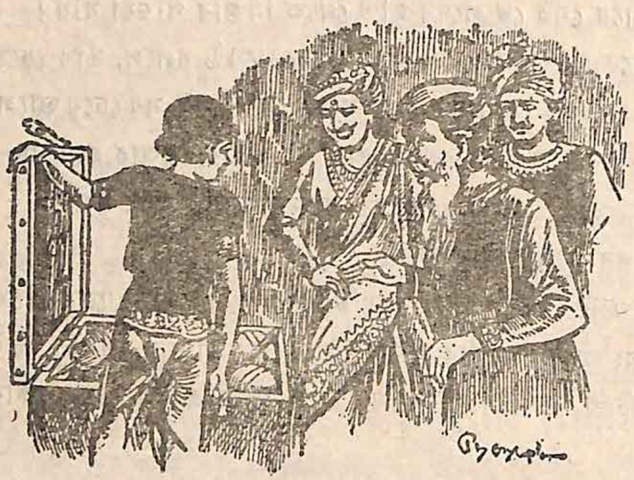
অবাধ্য ছেলেটি দরজার তালা একে একে খুলতে লাগলো। অমত্যাবর্গের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারা কানাকানি করতে লাগলো মনের আনন্দে।

তারপর দরজা খুলতেই দেখা গেল, ঘরের মধ্যে একটা বড় সিন্দুক।

রাজামশায় বললেন, খোলো সিন্দুক।

ছেলেটি সিন্দুকটা যেমন খুললে, অমনি তার মধ্যে ঠুন্‌ঠুন্ ক'রে কিসের শব্দ হলো। মন্ত্রীমশায় বললেন, রাজামশায়! শব্দ শুনলেন তো?

ছেলেটি কিন্তু সিন্দুকটা খুলে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। অমাত্যবর্গ বললে, বার করো শীগ্‌গির! ওর মধ্যে কি আছে রাজামশায়কে দেখাও!



…দেখে সকলের মুখ চুন হয়ে গেল…

ছেলেটি তখন যা বের করলে, তা দেখে সকলের মুখ চুন হয়ে গেল। লাটিম, গুলি, ঘুঙুর—ছোট ছেলেদের খেলার আরো কত কি জিনিস! রাজামশায়ের কাজ শেষ হ'লে ওরা রোজ রাত্রে এখানে এসে একটু ক'রে খেলাধুলো করে ওইসব নিয়ে।

রাজার তখন রাগে চোখমুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি তাঁর দেহরক্ষীদের হুকুম দিলেন, বাঁধো এই মিথ্যাবাদী মন্ত্রীদের। আমার সঙ্গে মিথ্যা প্রতারণা? এই সব সরল ছেলেমানুষদের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া? এদের আজ শূলে দেবো।

ছেলেটি তখন রাজামশায়কে বললে, এখানে আর কি দেখছেন! চলুন একবার বন্দীশালায়। আপনার বন্দীদের সব কীর্তি স্বচক্ষে দেখবেন সেখানে।

বন্দীশালায় গিয়ে রাজামশায় একেবারে হতভম্ব। দেখেন সেখানে তাঁর ছোট-বড় কর্মচারীরা কেউ আর বাকী নেই। সকলের হাতেই হাতকড়া লাগানো। এবং কে কি চুরি করেছে বা কত ঘুষ নিয়েছে, তার বিবরণ লেখা এক-একটা টিকিট এক-একজনের গলায় ঝুলছে।

রাজা বললেন, কাল সূর্য ওঠবার আগে এদের সকলকে আমি শূলে দেবো।

ছেলেদের পাণ্ডা বললে, প্রাণে না মেরে তার চেয়ে বরং এদের এইভাবে চৌরাস্তার মোড়ে এক-একটা খুঁটিতে বেঁধে রেখে দিন, আর যত লোক যাবে এদের দেখে যেন গায়ে থুতু দিয়ে যায়—তা'হলেই সব চেয়ে বড় শাস্তি দেওয়া হবে।

রাজামশায় তাই করলেন।

আশ্চর্য! পরের বছর দেখা গেল, রাজামশায়ের প্রজাদের আর কারো কোনো দুঃখকষ্ট নেই—রাজ্যের চারিদিকে শান্তি, শৃঙ্খলা আর আনন্দ। রাজা তখন দেশের যেখানে যত ছোট ছেলে ছিল সকলকে এনে, রাজ্য জুড়ে ছোটদের এক মহোৎসবের আয়োজন করলেন।

ছোটদের সে জয়ধ্বনিতে বড়দের বুক কেঁপে উঠলো।

ম্যাজিকের ভূত

এই নিয়ে দু'দিন হলো। জাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দেখবার টিকিট কাটতে গিয়ে ফিরে এলো বুবুন।

ওর দিদি সুচরিতা বলে, "আট সপ্তাহ চলছে এখনো এত ভিড়, বলিস কিরে!"

"হ্যাঁ, যত দিন যাচ্ছে তত যেন ভিড়ও বাড়ছে। ওঃ, কি লম্বা 'কিউ'! দেখলে তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে দিদি। শুনলুম রাত চারটে থেকে নাকি লোকে লাইন লাগায়!"

"কলকাতাটা এখন একটা আদিখ্যেতার রাজ্য হয়েছে।" বলতে বলতে ওদের মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, "স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়ে ভর্তি থেকে শুরু করে খেলাধূলা, সিনেমা, থিয়েটার, রেলের টিকিট কাটা পর্যন্ত যেখানে যাও, সর্বত্র ওই ব্যাপার। অথচ লোকের মুখে শোনো, দেশে পয়সার অভাব—মানুষ খেতে পাচ্ছে না, পরতে পারছে না!"

মেজ মেয়ে সুমিতা ব'লে ওঠে, "হবে না কেন মা? তোমাদেরি ঘরের একটা অর্ডিনারি ছেলে আজ দুনিয়ার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে জাদুসম্রাট উপাধি আনলে। পৃথিবীর সব জাদুকরের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করলে কেমন করে, কে না তা চোখে দেখতে চায় মা!"

সুচরিতা বলে, "তাছাড়া লোকটা বিজ্ঞাপনও দিতে জানে। দেখছিস না, ক'দিন ধরে লিখছে, ডাক্তারকে দিয়ে হার্ট পরীক্ষা করিয়ে তবে টিকিট কিনবেন! ভূতের খেলা দেখাবার সময় রোজই নাকি একজন দু'জন ক'রে অজ্ঞান হয়ে যায়।"

"ওসব গুলপট্টি! বিজ্ঞাপনের স্টাণ্ট! সবাই বোঝে।" সুমিতা বাঁকা মন্তব্য করে।

"কিন্তু বিলেত-আমেরিকাতেও এই ভূতের খেলা দেখানোর সময় কে কবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, সেখানকার কাগজের রিপোর্টগুলো পর্যন্ত তুলে দিয়েছে।"

বুবুনের ছোট বোন পিকুন বলে, "দাদা আমি যাবো না, আমার টিকিট কেটো না। আমার ভয় করছে। আমি মার কাছে থাকবো বাড়ীতে।"

ববি বলে, "ধ্যেৎ, ভয় কি! বেশ তো ভূতকে চোখে দেখতে পাবো। তুই বড় বোকা!"

পাঁচ বছরের ছেলে ববির ওই কথা শুনে সকলে একসঙ্গে যখন হেসে উঠলো, তখন সে খপ্ ক'রে তার প্যাণ্টের পকেট থেকে বন্দুকটা বার ক'রে বললে, "আমি এটা নিয়ে যাবো। গুলি ক'রে মারবো সেই ভূতটাকে।" বলেই ফট্ ক'রে ক্যাপটা ফাটালে।

অনেক কষ্টে পরের শনিবার টিকিট কেটে আনলে বুবুন। ওরা পাঁচ ভাই-বোন যখন সাজগোজ ক'রে বাড়ী থেকে বেরুতে যাবে, ওর মা বললেন, "একটু দাঁড়াও।" তারপর তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে ঠাকুরঘর থেকে মা-কালীর সিঁদুর এনে, ছেলে-মেয়ে সকলের কপালে ছোট্ট ক'রে এক-একটা টিপ পরিয়ে দিলেন।

বুবুন হেসে ওঠে, "এসব তোমার কি কাণ্ড, মা!"

মা বলেন, "হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ শনিবার, ভাদ্রমাসের অমাবস্যা। দু-দুটো আইবুড়ো মেয়েকে নিয়ে ভরসন্ধ্যাবেলা কি সব ভূত-প্রেতের খেলা দেখতে যাচ্ছিস—কিসে কি হয় বলা যায় না বাপু!"

বড় ও মেজ মেয়ে এবার হেসে গড়িয়ে পড়লো, "তোমার মাথাটা দেখছি খারাপ হয়ে গেছে মা। এ কি সত্যি? আমরা তো ম্যাজিক দেখতে যাচ্ছি।"

বুবুন হেসে বলে, "নাঃ, তোমাকে আর মানুষ করা গেল না, মা। তাহলে এই যে স্টেজের ওপর রোজ মানুষের জিভ কেটে দিচ্ছে, একটা মেয়েকে করাত দিয়ে দু'খানা ক'রে কেটে ফেলছে জাদুসম্রাট—সব কি তুমি সত্যি মনে করো?"

"জানি না বাপু অতশত। আমি মুখ্যু মানুষ, তোদের মত এত লেখাপড়া তো শিখি নি!"

সেদিন খেলাগুলো সবই খুব জমেছিল। একটা ক'রে শেষ হয় আর দর্শকদের করতালি-ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখর হয়ে ওঠে।

স্মিতা, সুচরিতা, পিকুন, ববি সবাই মুগ্ধ, বিস্মিত, হতবাক্!

বুবুন চুপিচুপি জিজ্ঞেস করে দিদিদের, "কিরে, কেমন লাগছে?"

"এক্সেলেন্ট! টাকা সার্থক! এ যেন বিশ্বাস করা যায় না যে ভোজবাজি দেখছি।"

সবশেষে শুরু হবে ভূতের খেলা। তার আগে স্টেজের ওপর পরদাটা বেশ কিছুক্ষণ পড়ে রইলো। দর্শকরা যখন অতি-বিজ্ঞাপিত সেই ভৌতিক দৃশ্য দেখার জন্যে কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারছিল না, ঠিক সেই বিশেষ মুহূর্তে দপ্ ক'রে প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত আলো নিবে গেল। অন্ধকার ঘুট-ঘুট করতে লাগল চারিদিক। সবাই নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে বসে আছে। কি দেখবে এখনি কে জানে!

পিকুন দাদার হাতটা খপ্ ক'রে চেপে ধরে বললে, "দাদা, বড্ড ভয় করছে!"

ববি দাদার গায়ের সঙ্গে নিজেকে লেপটে দিয়ে ফিসফিস ক'রে বলে, "আমার একটুও ভয় করছে না।"

তৎক্ষণাৎ শন্ শন্ ক'রে ঝড়ের শব্দের সঙ্গে হাঃ—হাঃ, হিঃ—হিঃ, হিঃ, খট্—খটা—খট্··· বিকট আওয়াজ শুরু হলো। কিম্ভুতকিমাকার সব প্রেতের মূর্তি সেই জমাট অন্ধকারে যেন কিলবিল ক'রে উঠেছে। কোনটা স্কন্ধকাটা, কোনটা গন্নাখেঁদা, কোনটার মাথার খুলির ওপর ভাটার মত রক্তবর্ণ দুটো চোখ জ্বলছে, কোনটার মুখের সামনে ঝুলছে মূলোর মত কয়েকটা দাঁত। কতকগুলো শুধু

কঙ্কাল, অদ্ভুত ভঙ্গীতে তারা নাচতে লাগল।

একটা—দুটো—পাঁচটা—দশটা—বিশটা নয় অগণিত। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে, মাথার ওপরে, যেদিকে তাকাও শুধু সেই বীভৎস ভূত-প্রেতের ভয়াবহ সব মূর্তি।

হঠাৎ ধপ্ ক'রে একটা আওয়াজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে হেলপ্ হেলপ্, ডাক্তার ডাক্তার, ব'লে দু'তিনজন চেঁচিয়ে উঠলো।

অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। মনে হলো অনেকগুলো জুতোর শব্দ দরজার দিক থেকে ছুটে এসে যেন কাকে ধরাধরি ক'রে চুপিসাড়ে বাইরে নিয়ে গেল। আশপাশ থেকে ফিসফিস আওয়াজ শুধু কানে এলো, অজ্ঞান হয়ে গেছে একজন যুবক।

খেলা চলছে। দর্শকপূর্ণ সেই প্রেক্ষাগৃহ স্তব্ধ থেকে স্তব্ধতর হয়ে ওঠে। সবাই যেন ভয়ে আড়ষ্ট, জড়সড়। কারো মুখে কথা নেই।

এমন সময় দরজার দিক থেকে কয়েকটা ভারী বুটের আওয়াজ এসে স্টেজের সামনে থেমে গেল। এবং গম্ভীর কণ্ঠে একজন ব'লে উঠলো, "মিঃ সরকার, শীগ্‌গির বন্ধ করুন এই মারাত্মক খেলা। নইলে আপনাকে এখুনি অ্যারেস্ট করবো। লালবাজার থেকে আসছি।"

জাদুকর সরকারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ওয়ান্, টু, থ্রি...

নিমেষে সব ভূত-প্রেতগুলো কোথায় মিলিয়ে গেল! দপ্ ক'রে আলো জ্বলে উঠলো। দর্শকরা দেখলো সামনে একজন পুলিস ইন্সপেক্টার দাঁড়িয়ে আছেন, কয়েকজন পুলিস কন্সটেবল সঙ্গে নিয়ে।

দর্শকরা হৈ-চৈ ক'রে উঠলো, "খেলা বন্ধ করতে দেবো না। আমরা পয়সা দিয়ে টিকিট কেটেছি!"

ইন্সপেক্টার সাহেব বললেন, "এইমাত্র যে যুবকটি খেলা দেখতে দেখতে অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন, তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক। তাঁর জীবনের জন্যে জাদুকরকে দায়ী হতে হবে, তা কি আপনারা জানেন?"

এবার জাদুসম্রাট স্টেজের সামনে এগিয়ে এসে বললেন, "এ অভিযোগ সত্য নয়। কারণ পৃথিবীর বড় বড় শহরে আমি এই খেলা দেখিয়েছি, কিন্তু কোথাও এরকম ঘটনা ঘটে নি। এভাবে আরো অনেক দর্শক সংজ্ঞাহীন হয়েছেন বটে, কিন্তু একটু পরেই মুখেচোখে জল দিয়ে বাতাস করতেই তাঁদের চৈতন্য ফিরে এসেছে। এটা আতঙ্কজড়িত সাময়িক দৌর্বল্য ছাড়া আর কিছু নয়। তবে যিনি এখনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, তিনি যদি আগেই অন্য কোন সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তার জন্যে কি আমি দায়ী? তাই আমি অনুরোধ করছি, সেই রোগীকে সকলের সামনে নিয়ে আসা হোক এবং এখানে দর্শকদের মধ্যে যদি কোন ডাক্তার থাকেন তাহলে তাঁকে আমি সাদরে আহ্বান জানাচ্ছি, তিনি রোগীকে এসে পরীক্ষা ক'রে দেখুন।"

"বেশ।" বলেই পুলিস ইন্সপেক্টার সাহেব বাইরে বেরিয়ে গেলেন এবং সেই রোগীকে ধরাধরি ক'রে স্টেজের ওপর নিয়ে এলেন।

এবার হাতজোড় ক'রে জাদুকর সরকার বললেন, "ডক্টরস্ ইফ্ এনি হিয়ার ডু প্লিজ কাম!"

সঙ্গে সঙ্গে এখান ওখান থেকে চার-পাঁচজন উঠে দাঁড়ালেন।

"ইয়েস্ ইয়েস্, ইউ অল্ কাম···প্লিজ্ !"

দুজন ইংরেজ ডাক্তার, একজন পাঞ্জাবী, একজন চীনা ও একজন বাঙালী একসঙ্গে স্টেজে উঠে একে একে রোগীর নাড়ী পরীক্ষা ক'রে সবাই একমত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, রোগীর অবস্থা খুবই সঙ্কট-জনক। এখুনি একে হাসপাতালে ভর্তি করতে না পারলে হয়ত জীবন বিপন্ন হয়ে দাঁড়াবে।"

জাদুকর সরকার বললেন, "এখুনি হাসপাতালে আমি ফোন ক'রে দিচ্ছি অ্যাম্বুলেন্স পাঠাবার জন্যে।"

ডাক্তাররা সবাই স্টেজ থেকে নেমে এলেন।

রোগী তখনো মূর্ছিতের মত পড়ে আছে। হঠাৎ একজন দাড়িওলা মুসলমান স্টেজের ওপর উঠে রোগীর মুখের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে বললে, "কোন রোগ নয় হুজুর, ওনার ঘাড়ে ভূত চেপেছে। ওনার মুখের ভাব দেখে আমি বুঝতে পেরেছি।"

চারিদিক থেকে একসঙ্গে রব উঠলো, "কে তুমি ?"

"আমি একজন ভূতের ওঝা। আমার তিনপুরুষের এই কাম, এই ব্যবসা হুজুর। কালুখালির রহিম সেকের ব্যাটা ছোলেমালি আমি। গাভা, গৈলা, পটুয়াখালির ওদিকে সবাই আমায় একডাকে চেনে। আমি এসেছিলুম হুজুরের খেলা দেখতে। ভূত-প্রেত নিয়ে সারা দুনিয়া জয় ক'রে এসেছেন শুনে একবার দেখতে এসেছি। আমি মুখ্যু মানুষ, আপনাদের মত লেখাপড়া শিখি নি, কিন্তু এটা জানি যে, ভূতে যাকে ধরে কোন ডাক্তার-বদ্যি বা কোন ওষুধ-ইন্‌জেকশন তার কিছু করতে পারবে না। আমি চল্লিশ বছর ধরে এই কাম করছি। ওস্তাদের দোয়ায় আর খোদার মর্জিতে আমার চিনতে কখনো ভুল হয় না।"

জাদুকরের-মুখে-চোখে তখনো অবিশ্বাস। তিনি বলেন, "সারা পৃথিবীতে এই খেলা দেখিয়ে এলুম, কখনো তো এমনধারা হয় নি ! সত্যি সত্যি ভূত তো কারুর ঘাড়ে চাপে নি !"

লোকটি বলে, "রহিম সেকের ব্যাটা ছোলেমালি কখনো ঝুট বলে না হুজুর। এক গ্লাস জল আনুন, আমি এখনি প্রমাণ দিচ্ছি।"

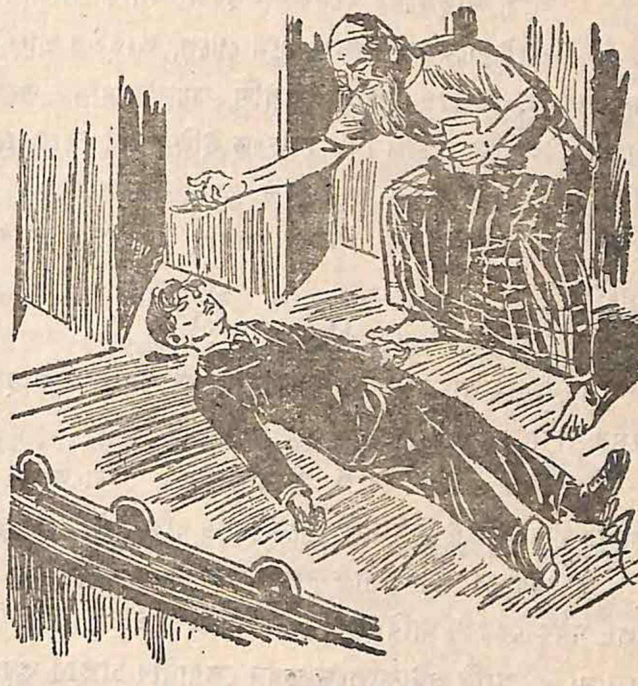
সঙ্গে সঙ্গে এক গ্লাস জলএনে তার হাতে দিতেই পকেট থেকে একখানা ভাঁজকরা সিল্কের রুমাল বার ক'রে স্টেজের ওপর বিছিয়ে ওঝা নমাজ পড়ার ভঙ্গীতে বসে বিড়বিড় ক'রে কতকগুলো কি মন্ত্র পড়ে, তারপর সেই জল নিয়ে রোগীর চারিপাশে তিনবার প্রদক্ষিণ ক'রে যেমন গ্লাসের জল রোগীর মুখের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে তিনবার ফুঃ—ফুঃ—ফুঃ বলেছে অমনি সেই অচৈতন্য যুবকটি গর্জে উঠলো, "কে তুই আমায় মারলি, তোর মুণ্ডু আমি চিবিয়ে খাবো !"

"আগে তো আমি তোর ঘাড় মটকাই, তারপর তুই যা পারিস করিস।" ব'লে ছোলেমালি আবার বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র পড়ে সেই জলটা ওর গায়ে ছিটিয়ে দিলে। অমনি নাকীসুরে সে চেঁচিয়ে উঠলো, "আবার মারছিস ?"

"আচ্ছা, আর মারবো না। তুই কে আগে বল্, কোথায় থাকিস, আর কেনই বা এত লোক থাকতে এর ঘাড়ে চাপলি! সব ঠিক ঠিক বল্, তাহলে কিছু করবো না। আর যদি মিথ্যে কথা বলিস, তাহলে সরষে-পোড়া হলুদ-পোড়া এবং শেষে লোহা-পোড়া মনে রাখিস! আমি এক—দুই—তিন যেই বলবো, অমনি তোকে বলতে হবে।"

এক ··দুই···দিন···

নাকীসুরে অমনি সেই যুবকটি বলে উঠলো, "আমার নাম মলয় সরকার। আমি থাকি জাদুকরের লালরঙের নতুন কাঠের বাক্সে। আর যার ঘাড়ে চেপেছি, সে আমার পরম শত্রু। অনেকদিন পরে তাকে পেয়েছি, তাই তার ঘাড় না মট্‌কে ছাড়বো না।"



···মন্ত্র পড়ে সেই জলটা ওর গায়ে ছিটিয়ে দিলে

"এঁর নাম কি? ইনির সঙ্গে তোর কিসের শত্রুতা? বল শীগগির"?

"এর নাম শঙ্কর সেন। হুগলী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে আমরা দু'জনে একসঙ্গে পড়তুম। ফাইনাল পরীক্ষায় আমার ফার্স্ট হবার কথা, কিন্তু ও বড়লোকের ছেলে বলে অনেক টাকা ঘুষ খাইয়ে ফার্স্ট হয়ে যায়। ফার্স্ট হলে কলেজের স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যেতুম, সেখান থেকে রিসার্চ ক'রে এলে ওই কলেজেই সাড়ে আটশো টাকার মত মাইনের চাকরি হতো। কিন্তু ও আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আমার জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দেয়। তাই আমি মনের দুঃখে হুগলীর পুল থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করি। কেউ একথা জানে না। জোয়ারের জলে ভাসতে ভাসতে আমার দেহটা একটা জঙ্গলের মধ্যে আটকে যায়। সেখানে শিয়াল-কুকুরে যখন আমার পচা দেহটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল তখন এক চামার আমার দেহ থেকে মাংসগুলো ছাড়িয়ে ফেলে, আমার হাড়গুলো নিয়ে কলকাতার এক দোকানে বিক্রী ক'রে দেয়। সেই দোকানদারের কাছ থেকে আমাকে কিনে নিয়ে এসে জাদুকর লাল কাঠের বাক্সয় আশ্রয় দেন। প্রতিদিন আমায় নিয়ে খেলা দেখিয়ে আবার সেইখানে ভরে রাখেন। এতদিন পরে আমার সেই চিরশত্রু শঙ্করকে পেয়েছি এখানে, আর কি ছাড়ি! তাই ওর ঘাড়ে চেপেছি।"

বড় বড় ডাক্তাররা সব হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁদের ডাক্তারী-শাস্ত্রকে ডুবিয়ে দিলে ওই একটা অশিক্ষিত গেঁয়ো ওঝা! তবু শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখার জন্যে তাঁরা সবাই সাগ্রহে অপেক্ষা করেন।

দর্শকরা সব ভেবাচেকা মেরে গেছে। তাহলে যতগুলো কঙ্কাল নিয়ে জাদুকর খেলা দেখালেন সবাইয়ের ভেতর সত্যিকারের ভূত আছে? চোখের সামনে এ দৃশ্য দেখার পর মিথ্যা বা বোগাস্ ব'লে তারা উড়িয়ে দেয় কি ক'রে?

আর, জাদুকরের মনের অবস্থা না বলাই ভালো।

একটু পরে অ্যাম্বুলেন্স এসে গেলে, জাদুকর তাদের ফিরিয়ে দিলেন। শঙ্কর সেনের বাপ-মা সঙ্গে ছিলেন, তাঁরাও কোন আপত্তি করলেন না। তবে জাদুকর সরকারের কানে কানে তাঁরা বললেন, "আমার ছেলে বিলাতফেরত ইঞ্জিনীয়ার, কলেজের স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত গিয়েছিল তাও সত্যি, কিন্তু ওই যে ঘুষ দিয়ে ফার্স্ট হয়েছিল বলছে, ওটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এতগুলো লোকের সামনে এইভাবে আমার ছেলের নামে অপবাদ দেওয়ার জন্যে আমি ওর নামে মানহানির মামলা আনবো।"

সকলের হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

"কার নামে মানহানির মামলা করবেন?" জাদুকর সরকার মিষ্টি হেসে প্রশ্ন করলেন শঙ্কর সেনের বাবাকে।

তিনি ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে ব'লে উঠলেন, "তাই ব'লে সকলের সামনে এই মিথ্যাকে মেনে নিতে বলেন!"

একজন বৃদ্ধ লোক দশ টাকার সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এর প্রতিবাদ করলেন। বললেন, "মলয় সরকারের 'স্পিরিট' যা বলেছে, তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। কারণ, আমার চেয়ে এ খবর বেশী কেউ জানে না। আমি ওই কলেজে তখন কেরানীর চাকরি করতুম। শঙ্কর সেনের নম্বর আমিই কেটে বাড়িয়ে দিই। আজ আট বছর হলো আমি রিটায়ার করেছি।"

দর্শকরা কেবল নয়, স্বয়ং জাদুসম্রাট পর্যন্ত হতবাক! একটা নাটক যেন তাঁর চোখের সামনে অভিনীত হচ্ছে!

লজ্জায় অধোবদন হয়ে শঙ্কর সেনের বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন।

ছোলেমালি তখন গলায় জোর দিয়ে বলে, "আজ্ঞে আমি তো আগেই বলেছিলুম ওনাকে ভূতে ধরেছে। তার প্রমাণ তো দেখলেন!"

শঙ্কর সেনের মা এবার হাতজোড় ক'রে বললেন, "আপনি আমার ছেলের ঘাড় থেকে ওই অপদেবতাকে নামিয়ে দিন দয়া ক'রে—আপনাকে আমি প্রচুর বকশিশ দেবো।"

"দিচ্ছি মা, আপনি ব্যস্ত হবেন না। যখন এতটা আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পেরেছেন, শেষটুকু করবো বইকি। দেখুন না এবার মোক্ষম মারণাস্ত্র ছাড়ছি।" বলেই চোখ বুজে বিড়বিড় ক'রে কতকগুলো কি মন্ত্র পাঠ ক'রে, পকেট থেকে দেশলাই বার ক'রে, জাদুকরের খেলার প্রোগ্রামটাতে

আগুন লাগিয়ে শঙ্কর সেনের মুখের কাছে যেই নিয়ে গেল অমনি সে হাঁউমাঁউ ক'রে লাফিয়ে উঠলো, "ওঁরে মেঁরে ফেঁললে রেঁ…"

"বল্ এখনি ওকে ছেড়ে চলে যাবি ?"

"হাঁ যাবো ।"

"ঠিক বলছিস ?"

"হাঁ ঠিক বলছি ।"

"আচ্ছা তা'হলে ওই যে সামনে 'ওয়াটার অব্ ইণ্ডিয়া'-র বড় কলসীটা জলে ভর্তি রয়েছে, ওটাকে শুধু দাঁতে ক'রে ধরে নিয়ে চলে যা, তবেই বুঝবো আমরা যে, তুই ওকে ছেড়ে দিয়েছিস ।"

সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে এসে শঙ্কর সেন সেই কলসীটা দাঁতে কামড়ে ধরে ছুটে স্টেজের ভেতরে চলে গেল । সকলে তার পিছনে পিছনে গিয়ে দেখলে শঙ্কর সেনের দেহটা মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে সেই লাল কাঠের বাক্সের কাছে ।

মুখে জলের ঝাপটা মেরে পাখার বাতাস দিতে দিতেই তার জ্ঞান ফিরে এলো । চোখ চেয়ে তার চারিপাশে এত লোক দেখে উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জিত কণ্ঠে সে তখন প্রশ্ন করলে, "আমি এখানে কেন মা ?"

ওর বাবা বললেন, "তোর শরীরটা খারাপ হয়েছিল ব'লে জাদুসম্রাট তোকে ভেতরে এনে বিশ্রাম করতে দিয়েছিলেন ।"

বাবা-মার সঙ্গে শঙ্কর সেন স্টেজ থেকে দর্শকদের সামনে নেমে গেল । ভেলভেটের পরদাটা স্টেজের ওপর ধীরে ধীরে যেই নেমে এলো, করতালি-ধ্বনিতে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ বারংবার মুখরিত হয়ে উঠলো ।

'জনগণমন' সঙ্গীত থামলে সকলে হুড়মুড় ক'রে দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো ।

বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিল বুবুনরা । একটা বাস চলে গেল । এত ভিড় যে ওরা উঠতে পারলে না । পিকুন বললে, "দাদা ভূত কে, যে লোকটা ওর বাবা-মার সঙ্গে স্টেজ থেকে নেমে গেল ?"

ববি ব'লে উঠলো, "ধ্যেৎ বোকা, ভূত তো তার বাড়ী চলে গেছে, না দাদা ?"

বুবুন কি জবাব দেবে ভাবছিলো । এমন সময় ওর রাঙাদি বললে, "লোকটা ম্যাজিকের সঙ্গে ড্রামা মিশিয়েছে চমৎকার । একেবারে সত্যি ব'লে ভুল হয়, না দিদি ?"

সুচরিতা অন্য কথা বুঝি চিন্তা করছিল । বললে, "ঠিক বলেছিস । ম্যাজিককে যে এইভাবে বাস্তবের রূপ দেওয়া যায়, তা চোখে না দেখলে কল্পনা করা কঠিন । জাদুসম্রাট উপাধি কি আর এমনি দিয়েছে লোকে !"

সামনে একটা 'ডবল ডেকার' আসতে ওরা হুড়মুড় ক'রে উঠে পড়লো ।

ভবিষ্যদ্বাণী

কি গো ফিরে এলে যে! আপিস গেলে না?

রামবাবু কোন কথা না ব'লে মুখখানা আরো গম্ভীর ক'রে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন এবং নিঃশব্দে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলেন।

শঙ্কিতমুখে রামবাবুর স্ত্রী দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে আবার প্রশ্ন করলেন, শরীর-টরির খারাপ হয় নি তো?

এবার খিঁচিয়ে উঠলেন রামবাবু, বলি শরীর খারাপ হ'লে কোনদিন আপিস কামাই করতে দেখেছো?

তবে ফিরে এলে যে, কি হয়েছে?

হবে আর কি, আমার মাথা আর মুণ্ডু! আবার সেই ভূতের নৃত্য শুরু হয়েছে। ট্রাম-বাস পুড়ছে।

ওমা, এই ক'টা মাস এখনো হয় নি, আবার—!

রামবাবু কণ্ঠে রাগ চেপে বললেন, বললে বিশ্বাস করবে না, পাঁচ-সাতটা চ্যাংড়া ছোঁড়া যেই এসে বললে, 'নেমে আসুন আপনারা', অমনি ওই বাসসুদ্ধ লোক যারা ঝুলতে ঝুলতে আপিস যাচ্ছিল সুড়-সুড় ক'রে নেমে পড়লো, কেউ মুখে 'রা' কাড়লে না। অমন সুন্দর বাসটায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারা পালিয়ে গেল।

রামবাবুর স্ত্রী বললেন, তুমি তো ছিলে, ছুটে গিয়ে ধরলে না কেন একটাকে?

বাপ রে! ভয়ে আঁতকে উঠলেন রামবাবু, তারপর যদি ছোরাছুরি পেটে ঢুকিয়ে দিতো, কিংবা অ্যাসিড বাল্‌ব মারতো, তখন?

তবে আর বলছো কেন, মুখে কেউ 'রা' কাড়লে না। প্রাণের ভয় তোমার মত সকলেরই তো আছে। কিন্তু মুখপোড়া পুলিসগুলো কি এসব চোখে দেখতে পায় না? ওদের ধরা তো তাদের কাজ। তারা মাইনে খাচ্ছে তো এইজন্যে।

ধরছে না যে কে তোমায় বললে? কিন্তু তারপর?—ব'লে কণ্ঠের রাগ দমন ক'রে নিয়ে বললেন, তারা জানে পুলিস থানায় ধরে নিয়ে গেলে তাদের ছেড়ে দেবে, তাই তো এতখানি বুকের পাটা!

ওমা, সে কি! শাস্তি দেবে না? জেল হবে না ওদের, যারা গভর্ণমেণ্টের এই সব লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে?

রামবাবুর গলা আরো একপর্দা চড়ে ওঠে। বলেন, জেল হ'লে তো আরো স্থবিধে—সেখানে তো ব্যাটাদের জামাই-আদর! একটুকরো মাছ যে চোখে দেখতে পায় না বাড়ীতে, ওখানে গেলে তার মাছ, মাংস, ডিমের পাকা ব্যবস্থা—সপ্তাহে কার কতটুকু পরিমাণ ঠিক আছে—তার মাপের এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটলে অমনি শুরু হবে ধর্মঘট। তাদের তুষ্ট করতে সবাই জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

রামবাবুর স্ত্রী এসব যেন নতুন কথা শুনছেন এমনি ভাবে বলেন, তাই নাকি! একে বলে শাসন!

হ্যাঁ, নইলে হারামজাদাদের এতখানি আস্পর্ধা হয় কোথা থেকে বুঝতে পারছো না? এখন কি ব্রিটিশ আমলের সেই ব্যবস্থা আছে? ওঃ, একবার স্বদেশী করতে গিয়ে একদিন হাজতে থাকতে হয়েছিল। ওরে বাপরে, সে কি মারতো! আজো সে কথা মনে হ'লে রাত্রে ঘুম ভেঙে শিউরে উঠি। আমাদের আমলে কত ছাত্র-ধর্মঘট, আইন-অমান্য-আন্দোলন দেখেছি। কিন্তু দু'দিনে সব ঠাণ্ডা ক'রে দিতো। বলে, মারের গুঁতোয় ভূত জব্দ হয়, মানুষ তো কোন্ ছার!

রামবাবুর স্ত্রী বলেন, তা সেই ব্যবস্থা পুলিসের লোকেরা করলেই তো পারে, তাহ'লে তো আর দেশে কোন অশান্তি থাকে না। নিত্যি নতুন হাঙ্গামাও দেশের লোককে পোয়াতে হয় না।

দাঁতের ওপর দাঁত চেপে রামবাবু বলেন, করবে কি? কতগুলো ভীরু কাপুরুষ, দুর্বল লোকের হাতে যে এসব শাসনের ভার! ভয়ে নিজেরাই কাঁপছে, ভয় করবে কেন লোকে তাদের? তাই সর্বত্র আজ বিশৃঙ্খলা। দেশে কোন শাসন নেই, নীতি নেই—চতুর্দিক অরাজকতায় ভরে উঠেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দীপক, মিনু, রিন্টু সবাই স্কুল-কলেজ থেকে ফিরে এলো। বললে, আজ স্ট্রাইক!

রামবাবু বললেন, রোজ রোজ চালাকি—স্ট্রাইক আর স্ট্রাইক! এসব মাস্টারদের কারসাজি। জানে মাইনে তো ছেলেমেয়েরা দেবেই।

দীপক কলেজে সবে এই বছর ঢুকেছে। বললে, না বাবা, মাস্টারদের কোন দোষ নেই, স্টুডেন্টরা ফটকে শুয়ে পড়েছে, প্রফেসরদের পর্যন্ত কলেজে ঢুকতে দেয় নি।

রিন্টু বললে, আমাদের স্কুলের গেট আগলে দাঁড়িয়ে আছে টেন-ইলেভেন-এর মেয়েরা।

রিন্টুর মা বললেন, তোরা এবার মাইনে দেওয়া বন্ধ করার জন্যে স্ট্রাইক কর্। বাপ-মায়েরা মুখে রক্ত তুলে, নিজেদের খাওয়া-পরা সব থেকে বঞ্চিত ক'রে কি কষ্টে যে স্কুল-কলেজের মাইনে যোগাচ্ছে, তা কি একবারও তারা ভেবে দেখে না! তাদেরও তো ঘরে ছেলেমেয়ে আছে। রোজ রোজ এই ট্রাম-বাসে কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা নষ্ট ক'রে যে ছেলেমেয়েরা সব ফিরে ফিরে আসছে এটা কি তারা চোখে দেখতে পায় না?

রামবাবু রাগে গরগর করতে লাগলেন, সবাই সব জানে, সবাই সব দেখছে, তবু কেউ

ছাত্রদের চটাতে চায় না। তাদের ভয়ে মুখ বুজে থাকে। সে কি আর কেউ বুঝতে পারে না! নইলে কোথায় ভিয়েৎনামে বোমা পড়ছে, এখানে তার জন্যে ছাত্রদের মাথাব্যথার অন্ত নেই—কেউ শুনেছে কখনো এমন কথা! আর মেনিমুখো মাস্টারগুলো হয়েছে তেমনি, কয়েকটা চ্যাংড়ার কথায় উঠছে আর বসছে! লেখাপড়া হবে ভেবেছো কারও, দেশ উচ্ছন্নে দেবে এই চ্যাংড়ারা, দেখে নিও!

কিন্তু এর কি কোন প্রতিকার নেই? দেশে এত সব বড় বড় বিদ্বান, পণ্ডিত, মাথাওয়ালা লোক থাকতে ওরা যা বলবে তাই হবে?—রিন্টুর মার গলা থেকে যেন আগুন ছিটকে বেরোয়।

রামবাবু বলেন, একদিন কর্তারা বুঝতে পারবেন যে কি ভুল করেছেন! সেদিন শুধু হা-হুতাশ ক'রে নিজেদের বুক চাপড়াতে হবে। এছাড়া আর কিছু উপায় থাকবে না দেখে নিও। আমি এ ভবিষ্যদ্বাণী করছি।

পরের দিন সংবাদপত্র খুলেই রামবাবু চমকে উঠলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ।

ওগো শুনছো, এই ছাখো কাল যা বলেছিলুম, হাতে হাতে ফললো! এই ছাখো কাগজে কি লিখেছে!—ব'লে রান্নাঘরের দিকে এলেন।

রিন্টুর মা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন, অ্যাঁ, ইউনিভার্সিটি বন্ধ অনির্দিষ্ট কালের জন্যে! কি হবে তাহ'লে? সবিতা যে এবার এম. এ. পরীক্ষা দেবে। তার বিয়েরও সব ঠিক হয়ে আছে, এম. এ. পরীক্ষাটা শেষ হ'লেই বিয়ে হবে।

হবে আবার কি? পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। তোমার বোন সবিতার একলা বিয়ে হবে না, আরও অনেক মেয়ের বিয়ে হবে—সবই বন্ধ থাকবে।

তা বাপু ছেলেরা যা চাইছে, তা মেনে নিলেই তো হয়। তাহ'লে এই হাজার হাজার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় না।

রামবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, তুমি থামো, যা বোঝো না তাতে ফোড়ন দিতে এসো না!

এইভাবে বেশ কিছুদিন স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকার পর, ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা মিলে একটা মহতী সভার আয়োজন করলেন, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। প্রবীণ শিক্ষাবিদ্, সাংবাদিক ও স্কুল-কলেজের বহু অধ্যাপক ও শিক্ষকরা তাতে অংশগ্রহণ করলেন। 'বর্তমান শিক্ষা-সংকট ও জাতির কর্তব্য' বিষয়ে নানা জনে নানা মত ব্যক্ত করতে লাগলেন।

প্রবীণ সাংবাদিক মহেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে সভাপতি মশাই প্রথমেই কিছু বলতে যেই অনুরোধ করলেন, সমস্ত সভা করতালিধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো।

মহেন্দ্রবাবু মাইকটার কাছে দাঁড়িয়ে প্রথমেই তীব্র ভাষায় সরকারকে কটু-কাটব্য করলেন। বললেন, মাথা থেকে তলা পর্যন্ত ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছে শুধু সরকারের স্বেচ্ছাচারিতায়। হাঁ, স্বেচ্ছাচারিতাই বলবো। কেননা কে না জানে যে জাতির মেরুদণ্ড হলো শিক্ষা এবং জাতির ভবিষ্যৎ যাদের ওপর নির্ভর করছে তারা হলো ছাত্রসমাজ। কিন্তু এই ছাত্রসমাজের শিক্ষার গুরুদায়িত্ব যাঁদের

ওপর, ভেবে দেখুন তাঁদের সঙ্গে শিক্ষার কতটুকু সম্পর্ক! কেউ মক্কেল ঠেঙিয়ে রোজগার করেছেন দীর্ঘদিন, কেউবা আর একটু উচ্চপর্যায়ভুক্ত—জজ ব্যারিস্টার বা ঊর্ধ্বতন এক সরকারী কর্মচারী। শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তাঁদের অনেককাল পূর্বে বিচ্ছিন্ন। অথচ এই সব ব্যক্তিকে এনে নৈবেদ্যের মাথার ওপরে সন্দেশের মত বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব চেয়ে দুঃখের কথা, এঁদের এক-একজনকে যে বেতন দেওয়া হয় তাতে দশজন আজীবন শিক্ষক, শিক্ষাব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, প্রবীণ সুঅভিজ্ঞ সুপণ্ডিত শিক্ষাব্রতী পোষা যায়। কিন্তু কে তাঁদের খবর রাখে? যে শিক্ষকদের হাত দিয়ে একদিন এই দেশের শত শত ছাত্র শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞানে-গরিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, ভারতের অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রের মত ঝলমল করতো, এখনো তাঁরা অনেকে জীবিত আছেন। অনুসন্ধান ক'রে তাঁদের এনে, স্বাধীন দেশের শিক্ষাধিকারের ভার তাঁদের ওপর অর্পণ করলে হয়ত আজ এইভাবে অনুশোচনা করতে হতো না। সেই সব অনভিজ্ঞ কর্তাদের ভুল শিক্ষানীতিই আজ দায়ী ছাত্রদের বর্তমান অবস্থার জন্যে।

এই ব'লে মহেন্দ্রবাবু বসে পড়তেই, করতালিধ্বনিতে সভা মুখর হয়ে উঠলো।

এবার সভাপতি মশাই প্রবীণ শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসুকে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণদয়ালবাবু মাইকের সামনে এগিয়ে আসতেই হাততালি দিয়ে সবাই তাঁকে অভিনন্দন জানালে।

কৃষ্ণদয়ালবাবু সরকারের ভুল শিক্ষানীতির কথা শুধু বললেন না, সেই সঙ্গে কি করলে এখনো ছাত্রদের মতিগতি ফেরানো যায়, সে সম্বন্ধে তাঁর মতামত স্পষ্ট ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন, যেদিন থেকে স্কুলে ছেলেদের শাস্তির ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে সেইদিন থেকেই আমরা ছাত্রদের সর্বনাশ ডেকে এনেছি। সত্যি কথা বলতে কি, একটু তলিয়ে দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে, স্কুলে পড়া না করলে যদি শাস্তি না পাওয়া যায়, তাহ'লে কেন ছেলেরা—যারা স্বভাবতই চঞ্চলমতি, ক্রীড়াপ্রবণ, কষ্ট ক'রে কেন পড়া মুখস্থ করবে, কেন শিক্ষকদের কথা শুনবে? শিক্ষকদের অমান্য করার প্রবৃত্তি এইখান থেকেই ছাত্রদের মনে জমতে শুরু করে। কারণ ভয় থেকেই ভক্তির সূত্রপাত—এই যে ঠাকুরদেবতার পূজো, তারও উৎপত্তিটা এই ভয় থেকে, ভুলে যাবেন না। তার ওপর আছে পাঠ্যপুস্তকের ত্রুটি। আগে ছেলেদের চরিত্র গঠন করার জন্যে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, নীতিগল্প, মহাপুরুষদের চরিত্রকাহিনী প্রভৃতি ছাত্রদের পড়তে হতো, তাতে বাল্যকাল থেকেই তাদের মনে একটা শ্রদ্ধাভক্তির প্রবণতা দেখা দিত। কিন্তু বর্তমানে ধর্মের কাহিনী, পুরাণ, নীতিগল্প পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে অনাবশ্যক বোধে। কাজেই ছেলেদের শিক্ষা থেকে যদি ভক্তিশ্রদ্ধা, ধর্ম বাদ যায় তাহ'লে 'গড্‌লেস এডুকেশন' থেকে কখনো ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হ'তে পারে না। পারা সম্ভব নয়। এইভাবে আমরা একটার পর একটা ভুল ক'রে নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মেরেছি। আজ এই যে চারিদিকে এত বিক্ষোভ, এত অশান্তি, এর জন্যে আমাদের ভুল শিক্ষানীতিই দায়ী। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক কেবল নয়, বাড়ীতে মা-বাপ জেঠা খুড়ো প্রভৃতি গুরুজনদের ভক্তি করতেও ছেলেরা ভুলে গেছে। বিজয়ার দিনে বাড়ী বাড়া গিয়ে

গুরুজনদের প্রণাম করার রীতি সেদিনও পর্যন্ত ছিল। কিন্তু আজ সেটা অসভ্যতায় দাঁড়িয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশী দূরে থাক, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতেও প্রণাম করতে যায় না। ছেলেদের মনে এই যে যা কিছু শ্রেয়-প্রেয়, তার প্রতি অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধার ভাব, এর জন্যে দায়ী এই 'গড্‌লেস্ এডুকেশন'। কাজেই স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থার যতক্ষণ না আমূল পরিবর্তন হচ্ছে, ততক্ষণ এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করা বাতুলতা ব'লে আমি মনে করি।

কৃষ্ণদয়ালবাবু এই ব'লে বসে পড়তে, একে একে আরো অনেকেই সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। শেষে সভাপতি মশাই বললেন, কেবল বক্তৃতা দিয়ে কোন ফল হবে না। আজ শিক্ষক ও অভিভাবক একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে ধর্মঘট করতে হবে, শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্যে এবং সত্যিকারের শিক্ষাব্রতী, উৎসর্গীকৃতপ্রাণ প্রবীণ শিক্ষকদের এনে তাঁদের হাতে শিক্ষাধিকারের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

কয়েকদিন পরেই শহরের শিক্ষক-অভিভাবকদের নীরব মিছিল বেরুল রাস্তায়। তাঁরা শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের দাবিতে ধর্মঘট শুরু করলেন, আর সেই ধর্মঘটকে জোরদার ক'রে তুলতে গ্রামাঞ্চলের অভিভাবক ও শিক্ষকের দলও এগিয়ে এলেন। দেখতে দেখতে সে আন্দোলন ছড়িয়ে গেল সারা দেশে।

সকলের বুকে নতুন আশা, এবার সত্যি সত্যি দেশে শান্তি ফিরে আসবে।

রামবাবু খবরের কাগজ খুলে সেই সংবাদ পাঠ ক'রেই স্ত্রীকে ডাকলেন, ওগো শুনছো ?

কেন, কি বলছো ?

এই ত্থাখো, আমি যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলুম এখন তাই হ'তে চলেছে।

দেখি দেখি,—ব'লে রামবাবুর স্ত্রী খবরের কাগজটা স্বামীর হাত থেকে টেনে নিলেন।

কথা কও

ভারতবর্ষ আজ নবজন্ম লাভ করলো। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে সে আজ পেলো মুক্তি। দাসত্বের যত কিছু গ্লানি, যত পাপ, যত অন্যায় অত্যাচার পীড়ন, শাসন ও শোষণ—আজ তার সব অবসান।

হে অবমানিত ভারত, তোমার সকল অপমান আজ বিস্মৃত হও। ক্ষমা করো তাদের যারা মিথ্যা-প্রচারে জগতের সম্মুখে তোমার নিন্দাবাদ করেছে, যারা নিজেদের মহিমা কীর্তন করার জন্যে তোমাকে ছোট করেছে, অসভ্য জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। আজ তাদের সকল অপবাদ তুমি ক্ষমা করো।

হে স্বাধীন ভারত, হে প্রবুদ্ধ ভারত, তুমি আজ জাগো। তোমার সেই অতীতের গৌরবময় মূর্তিতে জাগো। তোমার সে রূপ দর্শন ক'রে আবার আমাদের দেহ শুদ্ধ হোক, মন পবিত্র হোক।

হে ভারতভূমি, হে সভ্যতার আদি-জননী, ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারী আজ তোমাকে আহ্বান করছে। তুমি স্বাধীন দেশের বংশধরদের প্রণাম গ্রহণ করো। তুমি কালের শাসনকে তুচ্ছ ক'রে তোমার বুকের মধ্যে সস্নেহে লুকিয়ে রেখেছিলে তোমার যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সভ্যতার সব অতুলনীয় নিদর্শন—শত ঝড়ঝঞ্ঝায়, শত জলপ্লাবন ও ভূমিকম্পে, প্রকৃতির সহস্র অভিসম্পাতেও তুমি তাদের বক্ষচ্যুত করো নি। তোমার সন্তানদের মুখ তুমি উজ্জ্বল করেছো সারা পৃথিবীতে। তোমারই কৃপায় আমরা জানি আমরা কত বড়। হে আমার দেশের মাটি, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করো। মানুষ মরে যায়, কিন্তু তার ইতিহাস রেখে যায় তোমারই বক্ষে। তুমি তাকে সযত্নে রক্ষা করো তোমার স্মৃতির ভাণ্ডারে। তাই ভারতের আদি-সভ্যতার ইতিহাস রচনা করলো মহেঞ্জদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংস-স্তূপ। তার বাড়ী-ঘর-দোর, তার স্থাপত্যশিল্প ও ললিতকলার নিদর্শন দেখে পৃথিবীর লোক স্তম্ভিত। সঙ্গে সঙ্গে জগৎবাসীর কাছে এই সত্যটি প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আজ থেকে প্রায় পাঁচ-ছ'হাজার বছর আগে, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ভারতবর্ষ কতখানি সভ্য ছিল। জাতির সভ্যতা, শিক্ষা দীক্ষা বলতে যা-কিছু বোঝায়, তার চরম প্রকাশ হয় কাব্যে, সাহিত্যে ও ললিতকলায়। তাই তার মানসিক উৎকর্ষতার অন্যতম মানদণ্ড এই ললিতকলা।

ভারতবর্ষের ললিতকলার সেদিন যে অত্যাশ্চর্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল, তা কিন্তু ওইখানেই

শেষ হয় নি। এরপরে ক্রমশ ক্রমশ কেমন ক'রে তা সেই সভ্যতার ধারাটি অব্যাহত রেখেছিল তারও যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেছে পরবর্তী যুগে। যদিও মহেঞ্জদড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কারের পর বহুকালের ইতিহাস অন্ধকারময়, অর্থাৎ এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি, তবু আমার দৃঢ়বিশ্বাস, একদিন এর সন্ধান মিলবেই। কেননা এর দু'হাজার বছর পরে মহারাজা অশোকের রাজত্বকালের যে সব স্মৃতিস্তম্ভ পাওয়া গেছে, তা থেকে ভারতীয় ললিককলার এমন সুসম্পূর্ণ পরিচয় মেলে যে, তা কখনো হঠাৎ একদিনে সম্ভব নয়। শিল্পকলায় এই পূর্ণতা অর্জন করতে হ'লে বহুদিনের সাধনা বা প্রস্তুতির প্রয়োজন —একথা জগতের সব শ্রেষ্ঠ শিল্পীরাই মানেন। তাই অশোক-যুগের শিল্পনৈপুণ্যের উৎকর্ষতা দেখে তার পূর্বযুগ সম্বন্ধে সবাই একমত।

অশোক-যুগের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার বড় বড় স্তম্ভে আর স্তূপে।

অশোকস্তম্ভের গঠনচাতুর্য ও কারুশিল্প তাই পৃথিবীর শিল্পীদের কাছে আজো পরম বিস্ময়ের বস্তু। একটা অখণ্ড পাথর কেটে এই স্তম্ভটি তৈরী এবং আর একটি অখণ্ড পাথর থেকে এর মাথাটি। অশোকস্তম্ভের মাথাটির সৌন্দর্য ও শিল্পনৈপুণ্য সত্যই জগতে বিরল। চারটি সিংহ গোলাকারে দাঁড়িয়ে আছে পিছনে পিছন লাগিয়ে একটা বেদীর ওপর, আর সেই বেদীটির ওপর চক্র ও নানা কারুকার্য। আবার সেই বেদীর নীচে রয়েছে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম উল্টোমুখে। সবটা মিলিয়ে এমন সুন্দর ও মধুর এবং এত সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞান-সম্বলিত মূর্তি পৃথিবীর শিল্পকলায় খুব কমই দেখা যায়।

আজ স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার মাঝখানে শ্বেত-অংশে যে চক্রের মূর্তি দেওয়া হয়েছে তা এই অশোকস্তম্ভের চক্রের অনুকরণে। এত সুন্দর অথচ এত গভীর-ভাবময় কারুকার্য প্রথম এই অশোক-যুগের শিল্পকলাতেই রূপগ্রহণ করে। মৌর্য আর্ট তাই ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে এক অভিনব দান। মৌর্যদের পতন ও গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের মধ্যে যে পাঁচশত বৎসর কেটেছে, তার মধ্যে এই ভারতীয় ললিতকলার একটা সুস্পষ্ট ক্রমোন্নতি দেখা যায় এবং বিশেষ ক'রে এই সময় স্থাপত্য শিল্প নানা ধারায় এবং নানা নামে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জন্মলাভ করে। মধ্যভারতের নগোদ স্টেটের ভারহুত নামক স্থানে, বুদ্ধগয়ায়, ভুপাল স্টেটের অন্তর্গত সাঁচীতে, মথুরা, ও গান্ধার প্রদেশে, উত্তর ভারতে, অমরাবতী ও দক্ষিণ ভারতের নাগার্জুনিকোণ্ডায়।

খ্রীষ্ট জন্মাবার দু'হাজার বছর আগে সুঙ্গদের রাজত্বকালে ভারহুতের একটা বড় স্তূপ নির্মিত হয়। সে স্তূপের আর কোনো চিহ্ন এখন বর্তমান নেই, সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কেবল আছে একটা পাথরের রেলিঙের অংশ—লালবর্ণের পাথরের তৈরী, বুদ্ধের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ও জাতকের গল্পের অনেক দৃশ্য তাতে খোদিত আছে। এটি কলকাতার জাদুঘরের গৌরব বৃদ্ধি করছে। বুদ্ধগয়াতেও মন্দিরকে ঘিরে আছে যে ছোট্ট রেলিংটি, তাও প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার তৈরী এবং ভারহুতের সঙ্গে তার অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে।

সাঁচীতে যে বড় তিনটি স্তূপ পাওয়া গেছে তা মহারাজা অশোকের রাজত্বকালেই তৈরী। এর

রেলিংটা প্লেন, কিন্তু ফটকগুলোতে বুদ্ধের জীবনের অনেক কাহিনী খোদিত আছে। ভারহুতের সঙ্গে এটিরও হুবহু মিল লক্ষ্যণীয়।

মথুরা এ-যুগের ধ্বংসস্তূপের বৃহত্তম রত্নভাণ্ডার। ভারহুত বা সাঁচীর মত বড় বড় রেলিং এখানে নেই বটে, তবে কারুকার্যখচিত রেলিংয়ের ছোট ছোট টুকরো ও বহু মূর্তি পাওয়া যায় দেবদেবীর।

মথুরার ভাস্কর্যকে চেনবার সব চেয়ে সহজ উপায় হ'লো এর পাথরগুলোর বৈশিষ্ট্য—লাল রঙ এবং তার সঙ্গে এক রকমের দাগ সারা গায়ে।

গান্ধার প্রদেশের ভাস্কর্যকে একসময় ইউরোপীয়ানরা ভারতীয় শিল্পকলার সর্বোচ্চ নিদর্শন ব'লে মনে করতো এবং শিল্পজগতে চিরদিন যে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে এমনি ধারণাও তারা পোষণ করতো। গান্ধার-মূর্তি পাওয়া যায় তক্ষশিলার ধ্বংসস্তূপ থেকে এবং আফগানিস্থান ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বহু প্রাচীন স্থানে। বুদ্ধের মূর্তি ও বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনাই এই শিল্পকলার সর্বপ্রধান উপকরণ। এর সঙ্গে গ্রীক আর্টের অনেক সাদৃশ্য আছে ব'লে অনেকের ধারণা, গান্ধার-শিল্পকলার উৎপত্তি বুঝি এই গ্রীক আর্ট থেকেই। এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। যদিও এর ছন্দে গ্রীক-ধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, আসলে তার অন্তর্নিহিত ভাব কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয়। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, গান্ধার-শিল্পীদের হাতটা গ্রীক-শিল্পীদের মত আর মনটা ভারতীয়দের মত।

এইসব গৌরবময় শিল্পধারার কিছুকাল পরে কৃষ্ণানদীর তীরবর্তী উপত্যকাভূমির বহু স্থানে—অমরাবতী, জগজ্জপেটা ও নাগার্জুনিকোণ্ডায় এক রকমের সুন্দর স্তূপ নির্মিত হয়। মার্বেলের তৈরী রেলিং ছাড়াও তার মাথার উপরের গোলাকার আভরণটা ছিল পাথরের কারুকার্যখচিত। এই স্তূপগুলির ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ও মাদ্রাজের গভর্ণমেণ্ট মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত আছে।

নাগার্জুনিকোণ্ডায় সম্প্রতি যে স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায়, কয়েকটি চক-পাথরের টুকরোর ওপর বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি কাহিনী অতি সুন্দরভাবে খোদাই করা আছে। দু'শো থেকে তিনশো কুড়ি খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এইগুলি তৈরী ব'লে ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস। অশোকের সময় পাথর কেটে কেটে যে সব গুহা তৈরী করা হয়েছিল, সাধু-সন্ন্যাসীরা তার মধ্যে ব'সে ধ্যান করতেন, সেগুলিকে বলা হয়—চৈত্য অথবা উপাসনার স্থান। এই চৈত্যের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর হ'লো—কার্লের চৈত্য।

৩২০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হ'লো গুপ্ত-রাজত্বের কাল। এই সময় ভারতবর্ষের ললিতকলা চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সব চেয়ে বড় অবদান হ'লো বুদ্ধমূর্তি ও দেবদেবীর মূর্তি। এইসময় তা পূর্ণতা বা সুসম্পন্ন পরিণতি লাভ করে। ফলে ভারতীয় ললিতকলার ক্ষেত্রে কেবল এই গুপ্ত-ভাস্কর্য চিরকালের আদর্শ হয়ে থাকে নি, তখনই ছড়িয়ে পড়েছিল বৃহত্তর ভারতের উপনিবেশ সমূহে। তাই সুমাত্রা, জাভা, আনাম, কাম্বোডিয়া, মালয় প্রভৃতি স্থানের মূর্তিগুলিতে এই গুপ্ত আর্টের ছাপ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

গুপ্ত যুগকে ভারতীয় ললিতকলার স্বর্ণময় যুগ বলা হয়। এইসময় ধাতু-শিল্পেরও চরম উন্নতি হয়েছিল। দিল্লীর কুতবমিনারের নিকট যে লোহার স্তম্ভ তা এই গুপ্ত যুগের প্রারম্ভেই তৈরী।

নালান্দায় আশী ফুট উঁচু একটি তামার বুদ্ধমূর্তি দেখে চীন-পরিব্রাজক হিউ-য়েন-সাঙ্ মুগ্ধ হয়ে যান। এ ছাড়া চিত্রকলাতে গুপ্ত যুগ সর্বোচ্চ গৌরবলাভ করেছিল। অজন্তা গুহার যেসব দেওয়াল-চিত্র আজ পৃথিবীর বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে, তাও এই গুপ্ত যুগের অবদান।

গুপ্ত যুগের পরবর্তী দু'শো বছর শুধু স্থাপত্যশিল্পই ভারতীয় ললিতকলার গৌরববর্ধন করেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে যেসব বিখ্যাত মন্দির দেখা যায় তার অধিকাংশই এই সময় অর্থাৎ ৬০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী। এদের মধ্যে আবার দুটো ধারার সৃষ্টি হয়। উত্তর ভারতের মন্দিরগুলি সব এক শ্রেণীর আর দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি সব আর এক শ্রেণীর। উত্তর ভারতের এই শ্রেণীকে বলে 'ইন্দো-এরিয়ান', আর দক্ষিণ-ভারতের 'ড্র্যাভেডিয়ান'। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির, খাজুরাহোর মহাদেব মন্দির, রাজপুতানার অন্তর্গত আবু পাহাড়ের তেজপাল মন্দির—যেগুলি জগতের স্থাপত্যশিল্পে আজও অদ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে আছে এবং মহীশূরের হোয়সলেশ্বরের মন্দির এই দ্রাবিড়ধারার একটি উন্নত সংস্করণ।

এরপর তুর্কী পাঠান ও মোগলদের আমলে এই স্থাপত্যশিল্প যে কত উৎকর্ষতা লাভ করেছিল, তার নিদর্শন বহুল পরিমাণে রয়েছে দিল্লী, আগ্রা, বিজাপুর, গৌড় প্রভৃতি দুর্গে, মিনারে, মন্দিরে, মসজিদে।

প্রথম অভিযান

অয়ি! ভুবন-মনোমোহিনী .....
অম্বর চুম্বিত-ভাল-হিমাচল
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী।"

হিমালয় চিরকালই জগতের চোখে বিস্ময়। সারা পৃথিবীর লোক তার কাছে ছুটে আসে তাকে দেখতে। এ রকম দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় পর্বত পৃথিবীতে নাকি আর দুটি নেই। মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় তার দিকে তাকিয়ে। পৃথিবীর উচ্চতম শিখরমালা নিয়ে এই দুর্লজ্ঘ্য হিমালয় আজও দাঁড়িয়ে আছে তেমনি সগর্বে মাথা উঁচু করে। অনেকদিন ধরে বহু চেষ্টা করেও মানুষ ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে, তার তুষারধবল অম্লানশুভ্র শিখরে পা দিতে পারে নি।

মাউণ্ট এভারেস্ট বা গৌরীশঙ্কর হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ২৯,২৪১ ফুট উঁচু। একবার দু'বার নয় পাঁচ-পাঁচবার পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বহু বৈজ্ঞানিক এসে চেষ্টা করেছিলেন এই এভারেস্টের মাথায় ওঠবার, কিন্তু পাঁচবারই তাঁরা বিফল হন। তার জন্য কত লক্ষ টাকা যে খরচ হয়েছিল, কত লোকের প্রাণ যে গিয়েছিল—আর যাঁরা প্রাণ নিয়ে ফিরেও এসেছিলেন, তাঁরা যে কষ্ট ভোগ করেছিলেন তা বর্ণনা করা যায় না।

এত কষ্ট ক'রেও তবু ২৮,০০০ ফুটের বেশী উঁচুতে বৈজ্ঞানিকরা সেদিন উঠতে পারেন নি। বাকী এক হাজার ফুট বহুদিন অজেয় ছিল। মানুষ অনেক চেষ্টা ক'রেও তাকে জয় করতে পারে নি। এ পথটা এত ভয়ঙ্কর ও এমন বিপদসঙ্কুল ছিল যে, মানুষ কিছুতেই ওর বেশী আর অগ্রসর হ'তে পারতো না। এত উঁচুতে সাধারণতঃ অক্সিজেনের অভাবে লোকের মৃত্যু হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টার ফলে তারও ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁরা সঙ্গে ক'রে অক্সিজেনের সিলিণ্ডার নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও সুবিধা করতে পারেন নি। তার ওপরে প্রকৃতিও প্রতিকূল। বোধ করি বৈজ্ঞানিকদের দর্প চূর্ণ করবার জন্যই শুরু হ'লো বাতাস বইতে। ওঃ, সে কি ভীষণ আর কি বেগ! তুষারের কণা রেণু রেণু হয়ে মিশে গেল তার সঙ্গে। চতুর্দিকে একটা ধোঁয়ার মত আবরণের সৃষ্টি হ'লো। কোন দিক বাতাসে কিছু দেখা যায় না। শীতে হাড়ের মধ্যে কনকন করতে থাকে, কার সাধ্য সোজা হয়ে দাঁড়ায়? প্রবল বাতাসে মানুষ বেঁকে যায় যেন ধনুকের মত। তাছাড়া কোন্ দিকে পা বাড়াবে? একটু ভুল হয়ে গেলেই তো সর্বনাশ। অতলস্পর্শী পাহাড়ের গহ্বরে—

মুহূর্তে তুষারের মধ্যে জীবন্ত সমাধি ঘটবে। তাই আধুনিক বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে বারে বারে ফিরে এসেছিল ২৮,০০০ ফুট উঁচু থেকে।

এভারেস্ট ছাড়াও হিমালয়ের আরো প্রায় ১৬২টি শৃঙ্গ আছে, যাদের উচ্চতা ২৪,০০০ ফুটের চেয়েও বেশী। যেমন—কে ২৮,২৫০ ফুট, কাঞ্চনজঙ্ঘা ২৮,১৭৬ ফুট, জনসং ২৪,৩৪০ ফুট, কাবরু ২৪,০০২ ফুট এবং এ রকমের আরো বহু আছে যাদের সব নাম জানা যায় নি।

কারণ তখনো সেই সব পর্বতে অভিযান শুরু হয় নি।

সর্বপ্রথম সুইট্‌জারল্যাণ্ডের আল্পস্ পর্বতের ওপরেই মানুষ ওঠে। আল্পস্ খুব উঁচু না হ'লেও তার পথ ছিল যেমন দুর্গম তেমনি ভয়াবহ। সাধারণ লোক তাই ভয় পেয়ে সেদিকে বড় একটা ঘেঁষতো না। কিন্তু দুটি অসাধারণ লোক ভয় পেলেন না। তাঁরা বুক ফুলিয়ে তার ওপর গিয়ে উঠলেন। তাঁদের একজন হলেন সুইট্‌জারল্যাণ্ডের লোক, আর একজন হলেন ইটালীর। পৃথিবীতে প্রথম পর্বত অভিযানের পথ দেখালেন এঁরা দুজন। তারপর থেকে আরো বহু লোক অবশ্য তাঁদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে যশস্বী হয়েছেন।

তাঁদের কেউ উঠলেন ককেশাস্ পর্বতের চূড়ায়, কেউ আণ্ডেস্, কেউবা আমেরিকা, আফ্রিকা, আলাস্কা ও কানাডার গিরিশৃঙ্গে। দিকে দিকে তখন অভিযান শুরু হ'লো।

অবশ্য হিমালয়ের শৃঙ্গের কাছে এরা সব ছেলেমানুষ। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু পাহাড় আণ্ডেস্—এটি দক্ষিণ আমেরিকায়। তার শৃঙ্গের নাম হ'লো একন্‌কাগুয়া—২৩,০০০ ফুট মাত্র উঁচু। এ ছাড়া উত্তর আমেরিকার সব চেয়ে বড় পাহাড়টির নাম মাউণ্ট ম্যাক্‌কিনলি—২০৪৫৪ ফুট উঁচু এবং আফ্রিকার কিলিমানজোরো—১৯,৭০০ ফুট, আর আল্পস্—১৬,০০০ ফুট। এই হ'লো পৃথিবীর উঁচু উচু পর্বতশৃঙ্গগুলির নমুনা। এদের সঙ্গে হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গের তুলনা হয় না। তাই পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেস্টকে জয় করবার জন্যে দলে দলে লোক আসে। কারণ দুর্জয়কে, দুর্লঙ্ঘ্যকে জয় করতে গেলে যেমন বিপদ বেশী, তেমনি আনন্দ এবং খ্যাতিও অনেক বেশী।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, যে-গিরিশৃঙ্গ আজও পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে উঁচু, তা আবিষ্কার করেছিলেন আমাদেরই মত একজন বাঙালী। তাঁর নাম ৺রাধানাথ সিক্‌দার। ভারতীয় জরিপ বিভাগে তিনি চাকরি করতেন। সেই সময়কার সার্ভেয়ার-জেনারেল তাঁর পূর্ববর্তী কর্মচারী Sir George Everest-এর নামে এই গিরিশৃঙ্গের নামকরণ করেন Mount Everest। একজন বাঙালীর এই গৌরবে সমস্ত বাঙালী জাতি সেদিন গৌরব অনুভব করেছিল এবং আজও করে। যতদিন এই গিরিশৃঙ্গ পৃথিবীর বুকের ওপর মস্তক উন্নত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে ততদিন তাঁর নাম বোধ হয় পৃথিবীর কোন লোক কোন জাত ভুলবে না।

পৃথিবীর অন্যান্য গিরিশৃঙ্গ জয়ের পর একদিন বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি পড়ে ভারতবর্ষের এই হিমালয় পর্বতের দিকে। ইউরোপ, আমেরিকা থেকে তখন বহু অভিযানকারী ছুটে আসেন এখানে। তাঁরা কেউ উঠলেন কামেত পাহাড়ের গা বেয়ে ২২,২৬০ ফুট, কেউবা গেলেন গাড়োয়ালের পথে—

আর সকলের চেয়ে উঁচুতে উঠলেন জন্‌সন্‌—২৩,৮৯০ ফুট ওপরে কিউনলুনের এক চূড়ায়। শুধু যে পুরুষরাই এই কার্যে অগ্রণী হয়েছিলেন তা নয়, একজন স্ত্রীলোকও ছিলেন এই দলে। তিনি হলেন আমেরিকানবাসী ডাক্তার বুলক্‌ ওয়ার্কমানের স্ত্রী। তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে প্রায় ২৩,৪০০ ফুট ওপরে উঠেছিলেন। এ ছাড়া ডাক্তার লঙ্‌ফাস্ট নামক এক ব্যক্তি ত্রিশূল পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন, তার উচ্চতা ২৩,৪০৯ ফুট। ডগ্‌লাস ফ্রেস্‌ফিল্ড আবার নূতন ক'রে আবিষ্কার করেছিলেন কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই ডগ্‌লাস্‌ ফ্রেস্‌ফিল্ডই ককেশাস্‌ পর্বতে অভিযান ক'রে একদিন বিজয়গৌরব লাভ করেছিলেন।

হিমালয়ে এই রকম আরো অনেক শৃঙ্গ আছে এবং তাদের নাম বোধ হয় এদেশের লোক কিংবা তিব্বত দেশের লোকেরাই দিয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র দুঃসাহসিকতার আনন্দে, নতুনের সঙ্গে পরিচয়ের উৎসাহে, সমতলভূমি ছেড়ে পাহাড়ের সুউচ্চ শিখরে উঠতে তারা বোধ হয় ভয় পেতো। তাই বিদেশী অভিযানকারীরাই প্রথম এই পথে যাত্রা করেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া এভারেস্ট অভিযানের চিন্তা মানুষের মাথায় যায়। সেই সময় ব্রিটিশ সৈন্য বিভাগের বহু উচ্চতম কর্মচারী টিহ্‌রী গাড়ওয়াল, চিত্রল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি হিমালয়ের কোলে যে সব ছোট ছোট রাজ্য আছে সেখানে গিয়েছিলেন এভারেস্ট ওঠবার সঙ্কল্প নিয়ে। একবার ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কার্জন একটি দলকে এভারেস্ট অভিযানে পাঠাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু নেপালের রাজা তাঁর রাজ্যের মধ্য দিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন না ব'লে আর সে পরিকল্পনা কার্যকরী হ'লো না। সেখান দিয়ে পথ পেলে অতি সহজে এভারেস্টে পৌঁছানো যায়। আর তা নাহ'লে প্রায় দু'শো মাইল বেশী ঘুরে নেপাল ও তিব্বতের সীমানা দিয়ে যেতে হয়। আজও সেই নিষেধ চলে আসছে—এখনও যারা এভারেস্ট যায় নেপালের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। তাদের এইভাবে ঘুরে যেতে হয়।

এ ছাড়া আর একবার, ১৯১৩ সালে, এভারেস্টে ওঠবার কথা উঠেছিল, কিন্তু কাজে কিছু হয়নি।

সত্যিকারের প্রথম অভিযান শুরু হয় ১৯২১ সালে। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ ক'রে সেই অজ্ঞাত বিপদসঙ্কুল পথে যাবার জন্য যিনি সেদিন জীবন পণ করেছিলেন—সেই নির্ভীক পুরুষটির নাম ম্যালোরী। আজ আমি তাঁর সেই অভিযানের কথাই তোমাদের বলবো।

অবশ্য সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এই দুর্জয় এভারেস্টে ওঠার গৌরব তিনি পাননি। আজ তেন্‌জিং নোরগে ও এডমণ্ড হিলারীর নাম প্রথম এভারেস্ট-বিজয়ী ব'লে পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হ'লেও, একথা ধ্রুব সত্য যে ম্যালোরীর নাম এভারেস্ট-বিজয়ী ব'লে লেখা না থাকলেও সেই দুর্গম, দুর্লজ্ঘ্য গিরিপথের আদি ও অকৃত্রিম অভিযাত্রী ব'লে সেই নাম ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই মুদ্রিত থাকবে। একথা কেউ কোনদিন ভুলতে পারবে না যে পৃথিবীর উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ—সেই চিরতুষারময় এভারেস্টের কঠিন বক্ষে যিনি প্রথম স্থান পেয়েছিলেম তিনি জর্জ লে ম্যালোরী। এ ছাড়া এর পরে অন্যান্য অভিযানগুলিও সার্থক হয়েছিল তাঁরি চেষ্টায়। যদিও নেতা হিসাবে কর্নেল হাওয়ার্ড, মেরী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ব্রুশের নামই বেশী।

ম্যালোরী কেম্ব্রিজে অধ্যাপনা করতেন। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। অতি সুদর্শন এবং মিষ্টভাষী মানুষটি। অনাবশ্যক কথা বলেন না। তাঁর সারা চোখে-মুখে একটা দৃঢ়তার ছবি। আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের চেতনা যেন সকল অঙ্গে মাখানো। ১৯২১ সালে তিনি যখন প্রথম এই অভিযানে যোগ দিলেন তখন তাঁর বয়স তেত্রিশ। অভিযানের কথা উঠতেই, তিনি প্রথমে গিয়ে দলে নাম লেখালেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনে ঐ এক স্বপ্ন ছিল, পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে উঠবেন। কল্পনায় তিনি সেই ভ্রমণের আনন্দ সকল সময় উপভোগ করতেন।

অবশ্য এর জন্যে দায়ী হলেন মিঃ আরভিং। তিনি একজন অভিজ্ঞ পর্বত-অভিযানকারী। পাহাড়-পর্বত ছিল তাঁর একান্ত প্রিয়। এই মিঃ আরভিং ছিলেন এক স্কুল-মাস্টার। ম্যালোরী তাঁর স্কুলে ছেলেবেলায় পড়তেন। তখন থেকে মাস্টার মশাইয়ের মুখে পাহাড়ের গল্প শুনে শুনে তাঁর মনেও এই পাহাড়-প্রীতি জেগেছিল।

যাই হোক্, কমিটিতে গিয়ে ম্যালোরী যখন নাম লেখালেন, তাঁরা তখন তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে নিলেন। কারণ যাঁরা স্বার্থপর, নিজেদের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যটা বোঝেন সকলের আগে, তাঁদের নিয়ে এইসব কাজে যাওয়া বিপজ্জনক। সামান্য কোন কারণে হয়ত তাঁদের সঙ্গে কারুর মতের অমিল হ'লো, অমনি তাঁরা দল ভঙ্গ ক'রে চলে গেলেন অথবা কোন কাজটাই অন্তরের সঙ্গে করলেন না। তাহ'লেই সর্বনাশ। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে যে যশোমন্দির গ'ড়ে উঠছে—সারা পৃথিবীর লোকের জ্ঞানের জন্য, শিক্ষার জন্য যাঁরা প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন, তাঁদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এইসব দুর্গম অঞ্চলে এক মন, এক উদ্দেশ্য ও এক অনুপ্রেরণা নিয়ে না অগ্রসর হ'লে সাফল্য লাভ করা একেবারে সুদূরপরাহত।। তাই কমিটির সেক্রেটারী ম্যালোরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি শৌখীন লোক, এত কষ্ট কি সহ্য করতে পারবেন? হয়ত খাওয়ার কষ্ট হবে, শোওয়ার কষ্ট হবে, নয়ত একই থালায় কিংবা একই থলির মধ্যে কুলির সঙ্গে খেতে হবে, শুতে হবে—তা কি পারবেন?

ম্যালোরী হেসে বললেন, পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে পেলে খাওয়া ও শোওয়ার কি হবে আমি তা কিছুই ভাবি না। তাঁর মুখ থেকে এই কথা শুনে সেক্রেটারী ভারি সন্তুষ্ট হলেন।

পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার সব চেয়ে বড় বিপদ হ'লো এই যে, ৭,০০০ ফুট থেকে ১৭,০০০ ফুটের মধ্যে একই মানুষ যেন অন্য রকমের হয়ে যায়, তার মেজাজের ঠিক থাকে না। ১৬,০০০ ফুট থেকে যত এগোতে থাকে তত তার প্রকৃতিতে যেন পরিবর্তন ঘটে। সেইজন্য এই সব অভিযানে যাদের মনের দৃঢ়তা আছে এবং পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু, কেবল এই রকম লোকই বাছাই ক'রে নেওয়া হয়।

ম্যালোরীর এই সব গুণগুলি ছিল। তার পরিচয় অবশ্য পরে তোমরা পাবে। তাছাড়া তাঁর আর একটি বিশেষত্ব ছিল। পাহাড়ে তিনি উঠতে পারতেন সকলের চেয়ে আগে। সেখানে চলারও একটা গতি আছে, ছন্দ আছে। ধীর, স্থির এবং দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি অগ্রসর হ'তে জানতেন। তাঁর নিঃশ্বাস খুব দ্রুত পড়লেও তিনি সহজে হাঁপাতেন না। সমান তালে পা ফেলে চলতেন। পাহাড়ে ওঠবার এই কায়দা সকলে জানে না, তাই অপরে যত শীঘ্র ক্লান্ত হয়ে পড়তো, তিনি তত শীঘ্র হতেন না।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে ম্যালোরীর এই অভিযান শুরু হ'লো। বন্ধু বুলক ও দলবলকে নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন। নানারকমের গরম কাপড়, জামা, বর্ষাতি, বরফের ওপর দিয়ে চলবার কাঁটা লাগানো জুতো, টিনবন্দী খাবার, রঁাধবার সরঞ্জাম, ঘুমোবার ব্যাগ, তাঁবু প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক জিনিসপত্র যতদূর নেওয়া সম্ভব কুলির পিঠে বোঝাই ক'রে দার্জিলিঙ্ থেকে তাঁরা রওনা হলেন।

নেপালের মধ্যে দিয়ে যাওয়া নিষেধ। নেপাল স্বাধীন রাজ্য। সেখানকার লোকদের মনে এই বিশ্বাস যে, সেই পর্বতচূড়ায় দেবতা বাস করে। সেই পুণ্যস্থানে তারা নিজেদের রাজ্যের মধ্যে দিয়ে কোন লোককে উঠতে দেবে না। তাহ'লে দেবতা তাদের ওপর ক্রুদ্ধ হবেন, দেবতার স্থান অপবিত্র হয়ে যাবে। তাই প্রায় তু'শো মাইল পথ ঘুরে তিব্বত ও সিকিমের ভেতর দিয়ে ম্যালোরী এভারেস্টের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছলেন।

সিকিম থেকে তিব্বতে যাবার যে পথ তাই ধরে ধীরে ধীরে ম্যালোরীর দল অগ্রসর হ'তে লাগলেন। শেষে চলতে চলতে তাঁরা চুম্বী উপত্যকায় এসে পড়লেন। সিকিমের সীমান্তে এই স্থানটির দৃশ্য অতি মনোরম, নানাজাতীয় ফুল-ফলের গাছে শ্যামল ও স্নিগ্ধ হয়ে আছে। গাছের মাথায় মাথায় যেন রঙের জোয়ার লেগেছে। কত বিচিত্র বর্ণের, কত বিচিত্র রূপের ফুল-ফল বৃক্ষে, লতায়, কাননে প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে। কাশ্মীরের মত সেই স্থানটিও অপূর্ব সুন্দর—পাখীর কলকূজনে মুখর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুশোভিত।

সেখানকার অধিবাসীরা আরো সুন্দর। তাদের দেখলে মনে হয় যেন রূপকথার নরনারী। গায়ের রঙ তুধে আলতা গোলা, গালগুলো সব বসরাই গোলাপের মত লাল—আর তাদের পোশাক পরিচ্ছদে প্রজাপতির মত অসংখ্য রঙের সমাবেশ। তাদের সারাদেহে যেমন স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য, তেমনি তাদের প্রাণখোলা হাসি।

সিকিম ছেড়ে তাঁরা একেবারে এসে পড়লেন তিব্বত সীমান্তে। সেখানকার প্রথম শহর হ'লো ফারী। শহরটা যেমন নোংরা, তেমনি কুৎসিত। ম্যালোরীর মোটে ভাল লাগল না। শুধু তাঁর কেন, ইতিপূর্বে এই সব স্থানে আরো যাঁরা যারা এসেছিলেন কারো ভাল লাগেনি। সিকিম বা তিব্বতে এই অভিযান প্রথম নয়। একটি সুরক্ষিত তুর্গের চতুর্দিকে এই শহরটি গ'ড়ে উঠেছে। শহরের কর্তার উপাধি জং পেন। রাস্তাঘাটে ধুলো, ময়লা ছড়ানো। লোকগুলোর বেশভূষাও অত্যন্ত মলিন ও কদর্য। কিন্তু তাদের মন বেশ ভাল এবং চেহারাও অতি শান্তশিষ্ট ও ভদ্রগোছের। তারা যেমন পরিশ্রমী তেমনি বিশ্বাসী।

ফারী থেকে ম্যালোরী চললেন টাঙ্গা-লা পর্বত অতিক্রম ক'রে টুনায়। টাঙ্গা-লা পর্বতের উচ্চতা ১৫,২০০ ফুট। টুনা হ'লো সেই পথটির নাম, যেটি চলে গেছে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সোজা একেবারে তিব্বতে। অতি সুন্দর এই রাস্তা—উঁচু-নীচু অর্থাৎ চড়াই-উতরাই খুব বেশী নেই। এই পথ দিয়েই তিব্বত-অভিযানকারীরা একদিন তার রাজধানী লাসায় গিয়েছিলেন।

তিব্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অন্য রকমের। ভারতবর্ষের মত সেখানে বৃষ্টি নামে না সহস্র

ধারায়—কুয়াশার মত শুধু বিন্দু বিন্দু বর্ষণ হয়। তাই তার মাটির চেহারা গৈরিক ও পাহাড়ের মত কঠিন; কোথাও কোথাও বা জলের অভাবে মাটি ফুটি-ফাটা হয়ে আছে। গাছপালা নেই, বাগান বা সবুজ প্রান্তর নেই। পশুপক্ষীও নেই বললেই হয়। শুধু সারাদিনে কাঠ-ফাটা রোদে সমস্ত প্রকৃতি যেন মরুভূমির আকার ধারণ করে। কেবল হু-হু ক'রে একটানা হাওয়া বয়। কখনো তা পুড়িয়ে দেয় সর্বাঙ্গ, কখনো বা কাঁপন তোলে হাড়ে হাড়ে। কাজেই গ্রীষ্মকালে যেমন অসহ্য গরম, শীতে তেমনি দুর্দান্ত ঠাণ্ডা। সিকিমের ওই স্বর্গের মত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পর তিব্বতের এই দৃশ্য মন্দ লাগল না ম্যালোরীর চোখে। নীল, ঘন নীল, অনন্ত নীলিমায় ঢাকা আকাশ, মাথার ওপরে—আর নীচে যতদূর দৃষ্টি চলে রুক্ষ, কাঠিন্য এঁকেবেঁকে চলে গেছে। আকাশের চোখে যেমন কারুণ্য, মাটির বুকে তেমনি নিষ্ঠুর নির্দয়তা।

এইভাবে ম্যালোরী যখন খাম্বাজাং পৌঁছলেন তখন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো এভারেস্ট। সেখান থেকে তার দূরত্ব একশো মাইল, শুধু এভারেস্ট নয়, তার সঙ্গে আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ও মাকালু—পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের আর দুটি সুউচ্চ শৃঙ্গের একত্র সমাবেশ। এ দৃশ্য জগতে বিরল। বিরল কেন, আর কোথাও নেই বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। কেবল কারাকোরাম 'কে২' গিরিশৃঙ্গে হিমালয়ের এই সৌন্দর্য কতকটা অনুভব করা যায়।

সেদিন ১১ই জুন। ম্যালোরী ও তাঁর বন্ধু বুলক, অরুণ নদীর তীরে এসে দাঁড়ালেন। সেখানে ছিল ছোট একটা পাহাড়। তার ওপর থেকে তাঁরা অভিবাদন করলেন জগতের সেই বিস্ময়, সেই অনন্ত সৌন্দর্যময় পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়কে।

প্রথমে একটা কুয়াশার আবরণে ঢাকা ছিল ব'লে গিরিশৃঙ্গটা ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছিল না। কখনো একটুখানি মুখ দেখা যায়, আবার কখনো ঢেকে যায়। এই ক্ষণিকের দেখা-না-দেখার মধ্যে তাঁরা যে সৌন্দর্যের বিদ্যুৎ-বিকাশ দেখতে পেয়েছিলেন তাকে আবার পরিপূর্ণভাবে দেখবার জন্য তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন, দেবতার রুদ্ধদ্বার-মন্দিরে প্রতীক্ষারত ভক্তবৃন্দের মত। অবশেষে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। সেই রহস্যময় কুয়াশার যবনিকা অপসারিত হয়ে গেল। অস্তরবির শেষ রক্তিম আভায় তাঁরা দর্শন করলেন সেই জ্যোতির্ময় দেবদুর্লভ রূপ। চির-তুষারাবৃত অম্লান শুভ্র গিরিশৃঙ্গগুলির ওপরে যেন সূর্যদেব চলে যাবার আগে শেষবারের মত তাঁর সমস্ত রঙ ঢেলে দিলেন একসঙ্গে। তারপর ধীরে ধীরে একটির পর একটি রঙ মুছে দিতে দিতে যেন বিরসমুখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই অপরূপা ধরণীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে তাঁরা চেয়ে রইলেন সেইদিকে। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা কইতে পারলেন না। শুধু নীরবে তাঁরা বার বার সেই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্যের যিনি আধার তাঁর চরণে প্রণতি জানাতে লাগলেন।

এরপর যে পর্বতচূড়ায় তাঁরা এসে পৌঁছলেন তার নাম শেখরজং। ইতিপূর্বে আর কোন বিদেশী অভিযানকারীর পদচিহ্ন পড়েনি সেখানে। সেখানে একটি মঠ আছে, তাতে চারশো সন্ন্যাসী থাকেন। আর পাহাড়ের নীচে একটা ছোট শহর গ'ড়ে উঠেছে অল্প কয়েক ঘর লোক নিয়ে। এই মঠের মধ্যে

আছে অসংখ্য বড় বড় বুদ্ধমূর্তি, তাদের অধিকাংশ প্রায় দশ ফুট ক'রে উঁচু ও সোনালী রঙ করা। ধূপধূনা অগুরু-কস্তুরীর গন্ধে মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ যেন ভারী হয়ে থাকে। প্রকাণ্ড একটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে সেখানে দিনরাত।

একটা জিনিস দেখে ম্যালোরী অবাক হয়ে গেলেন। শহর থেকে এতদূরে, সভ্যতার একেবারে বাইরে বললেই হয়, অথচ জিনিসপত্র সেখানকার লোকেরা যা ব্যবহার করেন তাতে এমন সূক্ষ্ম কারুকার্য ও শিল্পকলার নিদর্শন এলো কোথা থেকে? কাঠের ওপর সুন্দর খোদাইয়ের কাজ বাস্তবিক খুব কম চোখে দেখা যায়। সেখানকার মানুষগুলিকেও তাঁর ভারি ভাল লাগল—বেশ হাসিখুশি ভাব, সরল ও পরিশ্রমী। সেই জায়গাটির উচ্চতা ১৭,০০০ ফুট। ইউরোপের উচ্চতম পাহাড় এর চেয়েও নীচু।

১৯শে জুন তাঁরা পৌঁছলেন টিংরীতে। এভারেস্ট সেখান থেকে মাত্র চুয়াল্লিশ মাইল দূরে। তাঁবু খাটিয়ে জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে সুস্থ হ'তে আরো তিনদিন তাঁদের কেটে গেল।

তারপর ২৩শে জুন ম্যালোরী ও তাঁর বন্ধু বুলক, দলবলকে সেখানে রেখে, মাত্র ষোলজন কুলি নিয়ে অগ্রসর হলেন অজ্ঞাত পথের সন্ধানে। তাঁদের বক্ষ সাহসে স্ফীত হয়ে উঠলো। নতুনের বিস্ময় পদে পদে তাঁদের চোখে নতুন রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করতে লাগল। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁরা এগোতে লাগলেন। কোথাও উৎরাই, কোথাও চড়াই, কোথাও বা সমতলভূমি। কখনো শীতের প্রবল হাওয়ায় তাঁদের হাড় কন্‌কন্ করতে থাকে; কখনো বা বন্ধ হয়ে গেলে তাঁরা শুধু বরফের সেই হিমশীতল আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে চলতে থাকেন।

এইভাবে ২৬শে জুন তাঁরা রংবুক উপত্যকায় এসে পড়লেন। আর মাত্র ষোল মাইল গেলেই এভারেস্ট। এবার শুরু হ'লো শুধু বরফের রাজত্ব। তলায় বরফ, পাশে বরফ, সামনে বরফ, যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু যেন সাদা তুষারের সমুদ্র। উঁচু উঁচু পাহাড়, খাড়া দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ ও কঠিন মূর্তিতে, তাদের সর্বাঙ্গে বরফের আবরণ। কোথাও কোন গাছপালা বা জীবনের চিহ্ন নেই। সকল প্রাণের স্পন্দন যেন থেমে গেছে সেখানে। নিস্তব্ধ পুরী যেন কার দুর্জয় শাসনের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। নড়ে না চড়ে না, এমন কি চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলতে যেন ভয় পায়। সেই সীমাহীন নীরবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে ম্যালোরী ও তাঁর বন্ধু একবার শুধু বোবার মত চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। তারপর সেই স্থানটা বেছে নিয়ে সেখানেই তাঁবু খাটালেন। ১৬,৫০০ ফুট উঁচু সেই স্থানটি। অর্থাৎ তখন তাঁরা এভারেস্টের বুকে অর্ধেকের বেশী পথ চলে এসেছেন।

রংবুকের এই বরফাচ্ছন্ন পথ যেমন বিপদসঙ্কুল তেমনি হাঁটা আরো কষ্টকর। ছোট ছোট অসংখ্য পাহাড়ের চূড়া বরফে সাদা হয়ে আছে, ঠিক যেন মার্বেল পাথরের থামের মত। রোদ্দুরে বরফ গলে গলে একটু একটু জল পড়ে, ধোঁয়ার আকারে বাষ্প উঠতে থাকে—চলতে চলতে যেন দেহ অবশ হয়ে পড়ে, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। ম্যালোরী তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন দলবল নিয়ে। কোন্ পথে যাবেন? চারিদিকেই তো পথ। যেদিকে তাকান সেদিকেই মনে হয় যেন পথ চলে গেছে। কাজেই পথ যে জানে না তার কাছে সবই তো পথ!

উনিশ দিন ধরে ক্রমাগত চলার পর ম্যালোরী এমন এক জায়গায় এসে পড়লেন যেখান থেকে আর এগোনো যায় না। পথ নেই। তিনি চারিদিকে তন্নতন্ন ক'রে দেখলেন, কিন্তু পথ আর কোথাও খুঁজে পেলেন না। তিনি তখন নেপালের দিকে হিমালয়ের যে অংশ সেইখানে গিয়ে পড়েছেন। সেখানকার দৃশ্য আরো সুন্দর। কিন্তু সামনে ভীষণ উৎরাই—১,৫০০ ফুট খাড়া পাহাড় নীচে নেমে গেছে। কাজেই সে পথে আর যাওয়া হ'লো না। আর একটি পথ যা ছিল সে পথে যেতে গেলেও প্রায় ৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে বেশী ঘুরে যেতে হয়। তাই সে চেষ্টা না ক'রে তিনি আবার ফিরে এলেন তাঁর দলে।

খার্টা উপত্যকায় তাঁবু ফেলে তাঁর দলের লোকেরা তখন অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা যে শুধু শুধু চুপচাপ বসেছিলেন তা নয়। তাঁরা তখন তিব্বত ও নেপালের মধ্যে যে সব স্থান আছে তার বিশেষত্ব লক্ষ্য করছিলেন। কেউ জরিপ করছিলেন, কেউ লতা-পাতা ফুলফলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করছিলেন। কেউ বা মাটির তত্ত্ব জানছিলেন। পাহাড়ের এইসব অভিযান শুধু যে তাঁরা দুঃসাহসিক কার্যের জন্য করেন তা নয়—সর্বদা তাঁদের লক্ষ্য থাকে কি ক'রে জগতের লোকের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে সেইদিকে। তাই তো লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এইসব অভিযানে।

খার্টায় ফিরে এসে ম্যালোরী আবার তাঁর দলের লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। অনেক হিসেব-নিকেশ ক'রে, অনেক মানচিত্র এঁকে, তখন তাঁরা স্থির করলেন এবার কোন্ পথ দিয়ে অগ্রসর হবেন।

ম্যালোরী আবার যেদিন সেখান থেকে যাত্রা করলেন সেদিন ৩১শে আগস্ট। কিন্তু হঠাৎ বর্ষা এসে পড়ায় ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। তাঁকে তাঁবুতে অপেক্ষা করতে হ'লো ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

আবার তিনি যাত্রা করলেন ২০শে সেপ্টেম্বর। বিশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে তিনি লাকপা লা চূড়া পার হয়ে গেলেন। তারপর ২২,৩৫৯ ফুট পর্যন্ত গিয়ে আবার তাঁবু ফেললেন।

২২শে সেপ্টেম্বর ভোর হতেই ম্যালোরী তাঁর দল নিয়ে রওনা হলেন এবং বেলা সাড়ে দশটার সময় হাক্‌পা লায়ের শৃঙ্গে এসে পৌঁছলেন। সেখান থেকে এভারেস্ট মাত্র দু'মাইলের দূরত্ব। কিন্তু এই দু মাইল পথটা ছিল ভারি অদ্ভুত। প্রথমেই এক ভীষণ উৎরাই—১,২০০ ফুট খাড়া নীচে নেমে গেছে। তারপর আবার ১,৮০০ ফুট চড়াই পেরিয়ে তবে নর্থ কোল-এর তুষারপ্রাচীরের কাছে পৌঁছানো যায়। কাজেই ম্যালোরী ঠিক করলেন সেদিনটা বিশ্রাম নিয়ে তার পরের দিন আবার রওনা হবেন।

কিন্তু পরদিন ভোর থেকেই এমন ঝড় শুরু হ'লো যে কার সাধ্য এগোয়! তুষার বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝড়ের সঙ্গে মিশে এমন প্রবল বেগে তাঁদের মুখে চোখে এসে লাগতে লাগল যে, তাঁদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হ'তে লাগল—হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকতেই যেন সব দম ফুরিয়ে যায়। কি সর্বনেশে হাওয়া! সেই সাংঘাতিক হাওয়ার কথা মানুষ কল্পনা করতে পারে না। আর তাঁদের অগ্রসর হওয়া হ'লো না। খাদ্যাভাব নয়, শারীরিক অসুস্থতা নয়, জিনিসপত্রের অভাবেও নয়—শুধু তীব্র পাহাড়ী বাতাসের জন্য সেবার ম্যালোরীর দল এভারেস্টে উঠতে পারলেন না। সেবারের মত সেখানেই যাত্রা শেষ ক'রে তাঁরা ফিরে এলেন। ব্যর্থ হ'লেও এভারেস্টের বুকে মানুষের সেই প্রথম অভিযান।

—শেষ—